তত্ত্বদর্শন

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক - বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের নানান দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য, কেন এই সৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস এই ভারতভূমি, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ এক একখানি মহাশাস্ত্র, গ্রন্থ, মহা জীবনসঙ্গীত। এই সঙ্গীত মানুষের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে এক পরমশান্তির পথে নিয়ে যায়। আবার ভারতীয় দর্শন সাম্রজ্যে যোগদর্শন বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। যোগশাস্ত্রকে দর্শনরূপে চিহ্নিত করার মূল কারণ হলো সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে যোগদর্শনের নিবিড় সম্বন্ধ। যোগদর্শনে পদার্থবিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও ধ্যানবিজ্ঞানের (আসন, প্রাণায়াম, রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদির) নিগূঢ়তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

যোগশাস্ত্র মুখ্যতঃ দৈহিক, মানসিক ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রে পরমশিব ও কুণ্ডলিনী শক্তির মিলনকে যোগ বলা হয়েছে। তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রে যোগের যে অর্থ মেলে, তা হলো আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ, জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। আত্মোপলব্ধি বা তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বদর্শনে সাধনার অঙ্গরূপে যোগের অবলম্বন অতি প্রাচীন। সাংখ্য, বৌদ্ধদর্শনেও যোগের মহতী উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে।

দর্শন বিজ্ঞানের বিরোধী নয়; বরং পরিপূরক। উভয়ের লক্ষ্য সত্যান্বেষণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে দার্শনিকদের যে অনুভব, তারই সত্যাসত্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের প্রয়াস। অথচ দর্শনের এই বিরাট এবং গভীর তত্ত্বকে বিকৃত করে আজকের সমাজে একশ্রেণীর ব্যক্তি সাধু গুরু মহান অবতার সেজে গুরুগিরির ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। তারা নিজ নিজ কল্পনা প্রসূত মতবাদ তৈরী করে সেই মতবাদকে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করবার জন্য বিভিন্ন উবাচ, ভাষ্য আর টীকা-টিপ্পনি তুলে ধরে জনগণকে এক চরম বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দিয়েছে। ভারতীয় সমাজ জীবন প্রায়শঃই ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তারফলে কিছুশ্রেণীর ব্যক্তি জনসাধারণের এই সেন্টিমেন্টের এ্যাডভান্টেজ নিয়ে তাদের পরগাছার মত শোষণ করে চলেছে।

এখন দেখা দরকার ধর্মের নামে কার ভরসায়, কার চিন্তায়, কার উপর নির্ভর করে লক্ষ কোটি লোক এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে দর্শনে ভাষ্যে আর 'উবাচ'তে দেবদেবী সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে বহু কথা বলা আছে। কিন্তু কিভাবে যে ভগবানের দর্শন মিলবে বা সকলের পক্ষেই ভগবদ্দর্শন পাওয়া সম্ভব কিনা, সেবিষয়ে সঠিকভাবে কিছুই বলা নেই। ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় হিসাবে বহু মত, পথ, সাধনা আর ধ্যানধারণার নির্দেশ আছে। কিন্তু প্রকৃত পথের হুদিশ দিতে গিয়ে এইসব তথাকথিত সাধু গুরু মহানরা যেন বেদিশ হয়ে গেছে। তাই ভগবৎ প্রাপ্তির সঠিক পথের সন্ধান দিতে আজও কেউ সক্ষম হয়নি।

শাস্ত্রের বাক্য অবলম্বন করে ঈশ্বর প্রাপ্তির আশায় সারাজীবন অনেক কষ্টকর অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি কিছু হয় এই আশায়। কিন্তু সত্যিকারের আশার বাণী কেউ তাদের শোনাতে পারেনি। বেশীরভাগ বাবাজী মহারাজজীরা শাস্ত্রের বুলি আওড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। মনগড়া চিন্তা করে যে আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাতে সত্য বলে কিছু থাকে না। তার সাথে সত্যতাও খুঁজে পাওয়া যায় না; প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই বিশ্বপ্রকৃতি এক অপরূপ নিয়মের সুরে বাঁধা। সাধনার পথ পদ্ধতি প্রকৃতির নিয়মের মাঝেই আছে। সেটা আলাদাভাবে তৈরী করা কোন জিনিস নয়। সেটা (সাধনা পথ পদ্ধতি) সৃষ্টির সাথে সাথে সৃষ্টির নিয়মের মাঝেই ন্যস্ত হয়ে রয়েছে। অনেকে কঠোর পরিশ্রম করে সাধনা করছেন। নানা নিয়মের মধ্য দিয়ে কত কঠিন কঠিন যোগ প্রাণায়াম করছেন, সেগুলি সবসময় আমাদের সংসারে থেকে চর্চা করা সম্ভব নয়, সংসারে থেকে সাধনার ক্ষেত্রে সম্ভব যা নয়, সে সম্পর্কে অসম্ভব বলে সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করাও উচিত নয়।

সৃষ্টির নিয়মই হলো যে কোন বেগ আপনা থেকেই আসে এবং সেটা সেইভাবেই স্ফূরণের ব্যবস্থা হয়। আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় যাবো, তা যদি জানতে পারতাম, তবে সৃষ্টি রহস্যের অনেক কিছুরই সমাধান হয়ে যেত। সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় এক একটি জীব কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিল? কেন কাক হলো? কেন বিড়াল হলো? এ সবেরও সমাধান সহজে হতো। ইচ্ছামতন মনগড়া কথা যে বলে যাবে, পাপের জন্য অথবা পুণ্যের জন্য কাক হলো বা বিড়াল হলো, তা চলবে না। এবিষয়ে সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন এবং প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। শুধু শাস্ত্র গ্রন্থ আর গল্প, কবিতা বা প্রেমের গ্রন্থই গ্রন্থ নয়। সৃষ্টির রহস্য জানতে হলে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। প্রকৃতির তত্ত্বদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তখনই তত্ত্বদর্শনের অমৃতের স্বাদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ দর্শনশাস্ত্রের বাস্তব বিষয়বস্তুর বস্তুত্বকে বুঝাবার জন্য কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিশেন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের একবিংশ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো, **তত্ত্বদর্শন**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী, শ্রী সুজয় চ্যাটার্জী, শ্রী উত্তম চ্যাটার্জী। এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ মহালয়া, ১৪১৫ — *চপল মিত্র*

ইং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

‘ভগবান আছে’, প্রমাণ দিতে পারছে না। শুট্‌কি ধর্ম পালন করছে

সুখচর ধাম
২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৯

আমাদের শাস্ত্রে, দর্শনে, ভাষ্যে আর ‘উবাচ’তে দেবদেবী সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে যে ভগবানের দর্শন মিলবে, সকলের পক্ষেই দর্শন পাওয়া সম্ভব কিনা, সেবিষয়ে সঠিকভাবে কিছুই বলা হয় নাই। ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে বহু মত পথ সাধনা আর ধ্যানধারণার নির্দেশ আছে। কিন্তু প্রকৃত পথের হদিশ দিতে গিয়ে সবাই যেন কেমন বেদিশ হয়ে গেছে। তাই বলা যায়, ভগবৎপ্রাপ্তির সঠিক পথের সন্ধান দিতে আজও কেউ সক্ষম হয়নি। তবু মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

শাস্ত্রের বাক্য অবলম্বন করে সারাজীবন নানা কষ্টকর অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে গেছে বহু মানুষ যদি কিছু হয়, এই আশায়। কিন্তু সত্যিকারে আসার বাণী কেউই তাদের শোনাতে পারেনি। বেশীরভাগ বাবাজী, মহারাজজীরা শাস্ত্রের বুলি আওড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গেছে।

তোমাকে বলা হ’ল শমদমাদি (অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়) জয় করতে হবে; কাম কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে। তুমি সবকিছু ভোগ বাসনা বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় মন নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছ। জীবনে যশ, মান, খ্যাতি কিছুই অর্জন করতে পার নাই। রাস্তায় নেমে গেছ। সেইদিনও তোমাকে সাধনায় লিপ্ত থাকতে হবে। সেইদিনও তুমি কোনরকম আশার পথে আশা নিয়ে চলতে পারবে না। সেই যে, রৌদ্রে পুড়বে, বৃষ্টিতে ভিজবে। মানুষের লাথি গুঁতা খাবে। তবুও তুমি তোমার সহ্যগুণ বজায় রেখে কাজ করে যাবে।

খুব সুন্দর কথা; উত্তম নির্দেশ। কথা হ’লো সেইসব উত্তম ও চরম নির্দেশাবলী সুন্দরভাবে পালন করা যায়। কিন্তু পালন করতে গিয়ে শেষ

ফলটা যদি না দেখা যায়, তাহলে ওসবে দরকার নাই। টাকা তো মানুষ অফিসে গোণে। সে কি মনে করে, আমার বাড়ীর টাকাগুলো গোণতাছি (গুণছি)? সে টাকা গুণে দিয়ে বাড়ীতে চলে আসে। সে কি অঙ্কটা বলতে পারবে না মানুষের কাছে? ‘আজকে আমি ২০ লাখ টাকা গুণে এলাম’, এই কথাগুলি বলতে তো পারবে? সেটা বললে তো কোন অশুদ্ধ হবে না? আমি ২০ লাখ টাকা গুণেছি, এতো সহজ সুন্দর কথা। সেতো ২০ লাখ টাকার অধিকার নিয়ে আসেনি।

Result-টাতো বলতে পারবে যে, ‘‘হ্যাঁ, তিনি (নারায়ণ) আমার গৃহে এসেছিলেন। আমি কোন কথা বলিনি। শুধু এই কথা জানিয়ে দিয়েছি যে, **যাঁর কাছে আমি নিজেকে নিবেদন করেছি, তাঁর যা খুশী, তিনি নিজের ইচ্ছায় আমাকে চালিয়ে নেবেন। আমি তখন এই কথাটা জানিয়ে দিয়েছি’’। এই কথাটাতো বলতে পারতো। ফলটা, Result-টাতো বলবে। এতদিন যে শুট্‌কি ধর্ম পালন করলো; শুকাতে শুকাতে একেবারে শুট্‌কি হয়ে গেল।** শুট্‌কি হইয়া তারপর Result-টাতো বলবে।

Result-টা জানানোর পক্ষে তো কোন অসুবিধা নাই। সে ভোগ না করুক, আকাঙ্খা না করুক, বাসনার দরকার নাই। শুধু সে জানাক যে, ‘‘আমার (তার) ঘরের সামনে স্বয়ং বিষ্ণু দাঁড়িয়েছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ দাঁড়িয়েছিলেন। আমি কর্ণপাত করিনি। চোখ দিয়েও দৃষ্টিপাত করিনি। তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করিনি।’’ সে তার কাজ নিয়ে আছে থাক, তাকে বিরক্ত করবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে? কথাটা বুঝতে পেরেছ? তবুও তো বুঝা যেত যে, Result-টা পাওয়া গেল; বিষ্ণু তার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। নারায়ণ এসেছিলেন। সে ভ্রূক্ষেপ করে নাই।

ইস্কুলে পরীক্ষার সময় সব অঙ্ক আমি করে দিলাম। জানা অঙ্ক দুটো বাদ দিয়ে দিলাম; কেটে দিলাম। সেটা আমার খুশী। আমি ফার্স্ট হবো না। ওকে (আর একজনকে) ফার্স্ট করবো। দেখলাম যে, ‘ও’ গরীবের ছেলে। ‘ও’ যাতে ফার্স্ট হয়, তারজন্য এটা করলাম। ‘ও’ ফার্স্ট হোক। কথাটা বুঝতে পেরেছ? সেটা হ’ল তোমার রুচি। তুমি তো জানলে, তোমার অঙ্ক ঠিক হয়েছে। এটাই তোমার তৃপ্তি। তারপর তুমি সেটা, যা ইচ্ছা তাই করো।

কিন্তু কথা হ'লো, তুমি যে সেই স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের কথা নিয়ে বসেছ, তার কোন হদিশ পেয়েছ কি? যদি জানতো হদিশ পাওয়া যায় বা কেউ পেত, তবে নিশ্চয়ই দেশের জনগণ সেইভাবেই ধাবিত হতো। ধাবিত তো হচ্ছে। ফল তো মিলাতে পারছে না। ফলেই যদি না মিললো, তবে এইরকম কাজে আমাদের যাওয়া উচিত কি? আমাদের জনমত সেইভাবে গড়ে ওঠা উচিত কি? ফল জানা হইল না, ফল মিললো কি না বুঝলো না; কেউ কিছু বুঝতাছে না। তাহলে ঐরকম কাজে আমাদের পক্ষে যাওয়া উচিত? বল? সুতরাং আমাদের কিরকম কাজে যাওয়া উচিত? কিরকমভাবে আমাদের গড়ানোর কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত?

সমস্ত কাজের একটা ফল বার করা উচিত, সেই ফলটার উত্তর সবাই এক উত্তর দেবে। সেইটাই হল উত্তর। উত্তর তো একটাই হবে সবার। তাহলে সেই উত্তরের মতোই সব জনমত গড়ে ওঠা উচিত। সেই পথেই সমাজকে চালনা করা উচিত। সেইভাবে সবাই চললে আর কোন problem থাকে না। কোন problem arise করে না। সেইভাবেই আমি বললাম যে, আমি যে সমস্ত প্রশ্ন করবো, যে মত ও পথের কথা বলবো, সেটা আমি আগেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলবো না। একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আগেই কোন মন্তব্য করবো না। সবার কাছে আমি তুলে ধরবো, আমার প্রশ্নগুলো।

সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি সবার কাছে জেনে নিতে চাই। উত্তরগুলো জেনে নিয়ে আমি ভারতবর্ষ বা পৃথিবীতে একটাই জনমত গড়াতে চাই এবং একমতে সবাইকে টেনে আনতে চাই। সেই মতে বা উত্তর জনগণের মুখেই আমি শুনতে চাই। জনগণ সেই উত্তর দিক এবং জনগণ সবাই উত্তরটা যা দেবে, সেইমতেই সবাই চলুক; সেইটাই আমি চাই। সেই প্রশ্ন আমি করবো। সেই প্রশ্নের উত্তর আমি সবার কাছে চাই। কথাটা বুঝতে পেরেছে?

ভারতবর্ষে এই ৬৫ কোটি লোক যেটা বলছে, আগে যারা ৪০ কোটি লোক ছিল, তারাও এটাই বলে গেছে। কারণ তা নাহলে পরবর্ত্তী জনগণের মুখে তাদের কথা আপনারা শুনতেন, জানতে পারতেন। ৪০ কোটি লোক যদি পেত, তাহলে ৬৫ কোটি লোক সেটা জানবে। আপনারা কয়পুরুষ, জানতেছেন (জানছেন)? আপনাদের আগে ৪০ কোটি, তারা আবার তার

আগের ৩০/৪৫ কোটি। তাইলে তিনটা পুরুষের ধারা পাইয়া যাইতেছেন (পেয়ে যাচ্ছেন) আমাদের আমলে ছিল ৩৩ কোটি। এখন হইয়া গেছে গিয়া প্রায় ৬০ কোটি, ৬৫ কোটি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঐ ৩৩ কোটি লোকের মধ্যে আজ কয়েক কোটি লোক নাই. তারা যদি পেত, তাহলে জানাতো। আর **এখনও লোকেরা যদি ভগবদ্ দর্শন বা দেবদেবতার সন্ধান পেত, তাহলে জানাতো। পায়নি বলে জানায় না। তাহলে তোমরা কিসের আশায়, কোন্ ভরসায় থাকবে? শুধু ভবিষ্যতের ভরসায় থাকা যায় না। ভরসায় থাকা যায়, যদি তার সত্যতা প্রমাণে পেত। সেটা যদি প্রমাণে আসতো, তাহলে ভরসায় থাকা যায়। যেটার প্রমাণই নাই, সে ব্যাপারে কার উপর ভরসা করে থাকবে বল?**

সুতরাং এমনভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে, যাতে জনমতগুলো সেইভাবে এগিয়ে আসে। ঐভাবে এগিয়ে এনে এনে একটা মতে সবাইকে নিয়ে ফেলতে হবে। এর আগে বলেছে যে, ভগবানের দর্শন আমরা কিছুই পাই নাই। আমরা কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না। কিছুই বুঝি না, এক self-satisfaction (আত্মতৃপ্তি) ছাড়া। ঐটা মনে মনে হয়। মনে মনে রাজা প্রজা হয় না মানুষ? একটা ছেলে মনে মনে চিন্তা করতাছে (করছে), 'আমি যদি সবচেয়ে সেরা একটা সুন্দরী মেয়ে পেতাম।' আবার একটা মেয়ে চিন্তা করছে, 'আমি যদি ভাল একটা ছেলে পেতাম। বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা, রূপে গুণে গানে নাচে একেবারে firstclass, সবদিকে famous থাকবে; সেরকম একটা husband যদি পেতাম, কি চমৎকার হতো।' চিন্তার সাথে সাথে চোখে মুখে প্রেম ফুটে উঠেছে। শুয়ে শুয়ে সে পান খাচ্ছে আর চিন্তা করছে। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এইটাও তো একটা আনন্দ, যেই আনন্দ মনে মনে পাওয়া যায়। তারপরে যখন ঘুম ভেঙে তাকায় চারদিকে, ''আরে সর্বনাশ, কিসের মধ্যে পড়লাম।''

এইরকম পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান— এসবেও তো পাওয়া যায় ব্যক্তিগত একটা আনন্দ। এই দেবীপূজা করলাম, এই মূর্ত্তিপূজা করলাম, এই ঢাকঢোল পিটাইল, এই আরতি করলাম, এই নাচলাম, এই মন্দিরে গেলাম, এই তীর্থে গেলাম। এই জল ঢেলে এলাম, এই চরণামৃত খেয়ে এলাম। এই বেলপাতা দিয়ে এলাম। এই হেঁটে হেঁটে পাহাড়ের উপরে উঠলাম কত কষ্ট

করে করে। এই 'ভোলাবাবা পার করে গা' করতে করতে উঠেছি। নিশ্চয়ই ভোলাবাবা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। নিশ্চয়ই আমি সেখানে কিছু পাবো। নিশ্চয়ই আমার কিছু হবে। এই করতে করতে, করতে করতে ১৬ বছর থেকে আরম্ভ করে ৮০ বছরে এসে পৌঁছেছে। এখন আর চলতে পারে না। বাড়ীতে বসে বসে ঝিমতাছে (ঝিমাচ্ছে)।

এখন তাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'কিহে, কত পরিশ্রম তো জীবনভর করেছ। এখন তোমার কি গতি?'

সে বলছে, 'এখন আর চলতে পারি না, উঠতে পারি না। কোনরকমে আছি। ভগবান যা রক্ষা করার করবেন।' কিন্তু হতাশ তো হয়ে গেল। এটা তো self-created, নিজের সৃষ্টি করা। **মনগড়া চিন্তা করে করে যে আনন্দকে উপভোগ করা যায়, তাতে তো সত্য বলে কোনকিছু পাওয়া যায় না। তার সাথে সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা আজগুবি গল্প চিন্তা করে করে আজব দেশে গিয়ে রাজা সেজে বসলে। মনে মনে চিন্তা করে আজব দেশে গিয়ে রাণী সেজে বসলে। স্বামী মরে গেছে। আর তুমি মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেজে মনে মনে রাজত্ব করে এলে।** তারপরেই দেখি, কেরোসিন তেলের বোতল লাইয়া (নিয়ে) রেল লাইনের উপর দিয়া চলছো হনহন কইরা (করে)। কিছুক্ষণ আগেই রাজত্ব কইরা (করে) আইছো। এই তো চলছে এইখানে।

এত উপদেশ দান করছে সবাই। কত রকমের কথা, কতরকমের নির্দেশ, কত উপদেশ, কতকিছু। আমি যদি বলি, একটা ভেল্কিবাজীর খেলার মধ্যে সবাই রয়েছি আমরা। ঐ যে ঘুরনার মধ্যে ঘোরে না? সবগুলো আমরা নাগরদোলার মধ্যে যে ঘুরছি না, তার প্রমাণ কি? আমি তো বলি না যে, আমরা নাগরদোলায় ঘুরছি। একথা আমি বলছি না। তোমরা আমাকে জবাব দাও। আমরা কি নাগরদোলায় ঘুরতাছি (ঘুরছি)? না, ভেল্কিবাজীতে ঘুরতাছি? না, Emotionally ঘুরতাছি? না, সেন্টিমেন্টের এ্যাড্‌ভান্টেজ (advantage) নিয়ে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে? কার ভরসায়, কার চিন্তায়, কার উপরে নির্ভর করে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক এগিয়ে যাচ্ছে? তার তো কোন ফলাফলও বুঝছি না বা তার কোন অঙ্কের

রেজাল্টতো বুঝছি না। এ বিষয়ে কোনকিছুই তো জানতে পারছি না। তবে সবটাই সফল হতো যদি জানতে পারতাম। জানতে না পারায়, তখন যদি বলে, 'জানতে না পারাটাই এটার বিশেষত্ব', সেটাতো বিজ্ঞানসম্মত নয়, যুক্তিসম্মত কথা নয়। এতদিন ধরে এত কথা বললে যে, তাঁকে জানা যায়, বুঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়। অনুভূতি, সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণের সম্বন্ধে এত কথা বলা হ'ল। এত করে, সারাজীবন ধরে এত চেষ্টা করে যখন দেখি failure, তখন একেবারে বেড়া দিয়ে দিলে। একেবারে কাঁটার বেড়া দিয়ে বসলে যে, 'না জানাটাই এটার বিশেষত্ব। এটা জানা যাবে না, এটা বুঝা যাবে না।' না জানাটাই এটার বিশেষত্ব— এটা বলে কাঁটা দিয়ে রাখলেন। তাহলে তো বুঝা গেল, আমাকে ঠেক দিয়ে রাখলে। ঠেক দিয়ে রাখার তো কোন অর্থ হয় না। তখন তো বৃদ্ধ বয়সে কোন অনুভূতি নাই। আর কিছু করার সামর্থও নাই। কথা হলো, এগুলো সম্বন্ধে genuinity কোথায়? Result যাকে বলে, ফলাফলও বলা যায়, সেটা না পাওয়া অবধি, কোন কাজে আমাদের যাওয়া উচিত কি? এইভাবে পথ বানানো (গড়ানো) উচিত কি? এইভাবে চিন্তা করা উচিত কি?

যতই এর সত্যতা থাকতে পারে, ন্যায়নীতি থাকতে পারে, এর স্বর্গ-মর্ত্ত্য থাকতে পারে; আত্মার শুভ-অশুভ থাকতে পারে, সব না হয় ধরে নিলাম, ধরে নেওয়ার মতনই হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণে আসতে পারছে; প্রমাণ যখন আসবে, তখন এগুলো সবই আমরা মাথা পেতে মেনে নেবো। এর আগে পর্যন্ত এগুলোর বোঝা মাথায় নিয়ে আমরা দৌঁড়াচ্ছি। এসবগুলো মাথায় নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি আর গুঁতাগুঁতি খাচ্ছি সবাই। সবাই গুঁতাগুঁতি খাচ্ছি এখন। গুঁতাগুঁতির দুর্ভোগ থেকে যাতে রক্ষা পেতে পারি, তার একটা উপায় এখন চিন্তা করা উচিত। সেই চিন্তাটা তোমরাই করো। তোমরাই বলো, আমাদের এখন কি করা উচিত? কোন্ পথ ধরা উচিত? কোন্ মত ধরা উচিত? সেইভাবে গড়ে উঠুক আমাদের জনমত, আমাদের জনপথ।

আমরা বলি না, এই ছেড়ে দাও, ঐ ছেড়ে দাও। আমরা কোন ছাড়াছাড়ির মধ্যে যেতে চাই না। কোনকিছুই আমরা ছাড়তে চাই না। সবকিছুই গ্রহণ, করতে চাই। তাতে একটা নিদর্শন চাই যে, 'আছে'। এটুকু বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। এটুকুই তো বুঝতে পারছি না। প্রমাণ হচ্ছে না। এই

প্রমাণটুকু দিতে পারছে না। 'আছে'-র প্রমাণ দিতে পারছে না। তবে কার উপরে নির্ভর করবো বল? সেটাই সেইভাবেই প্রশ্ন করে করে সবার কাছে ছেড়ে দিতে হবে। সবার কাছে ছেড়ে দিয়ে সকলের মতগুলি নিতে হবে। তখন আমরা বলবো, **যদি আপনারা সঠিক উত্তর না দিয়া ফলাফল সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল না করেন, তাহলে বুঝবো, আপনারা ইচ্ছা করে বদমাইসি করছেন। আর সবাইকে রসাতলে ডুবাবার ব্যবস্থা করছেন। আপনারা সমাজকে বিভ্রান্ত করছেন আর শোষণ করছেন। কথা বুঝতে পেরেছ?**

আমরা চাই আপনাদের কাছে সঠিক পথ। আপনারা হয় সঠিক উত্তর দিয়ে আমাদের পথে নেন, না হলে পথগুলো ছেড়ে দিয়ে সবাই একপথে আসুন। আমরা সঠিক মত ও পথ চাই। তবুও যদি আপনারা সঠিক উত্তর না দেন, সঠিক পথের কথা না বলেন, তাহলে বুঝবো, আপনারা জেনেশুনে ইচ্ছা করে বদমাইসি করছেন। ইচ্ছা করে মানুষগুলিকে বিভ্রান্তির পথে টেনে নিচ্ছেন। আপনারা সবাইকে দারিদ্র্যের পথে, বৈষম্যের পথে, ছল চাতুরীর পথে এবং নিম্নস্তরের পথে টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করে সমাজকে উচ্ছন্নের পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এটাই ধরে নিতে হবে। তা নাহলে পথ পরিষ্কার করুন। আমরা তো অন্য কিছু চিন্তা করতে চাই না। একটা সঠিক পথ না বললে কি করে হবে?

পালোয়ান আসছে কুস্তি করতে। সেই পালোয়ান যদি সইরা (সরে) পরে, তাহলে বুঝবো যে, পালোয়ান ভয় পেয়ে গেছে। কথাটা বুঝতে পারলে না? আমি তো চাই কুস্তি করতে। তারা আসুক, লড়াই করি। আমায় দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও। তারা যদি ছাতি মাথায় দিয়া দৌড়াতে আরম্ভ করে, সেটা তো ঠিক না। বাঘের ভয় শিয়ালের। এখন শিয়ালের ভয়ে যদি বাঘ দৌড়ায়, সেটার তো অর্থ হয় না কিছু। তারা আমার সামনে আসতেই চায় না। তাহলে মীমাংসা হবে কি করে? আজ এখানেই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জীব জগতে জন্মগ্রহনই হচ্ছে প্রকৃত সন্ন্যাস

সুখচর ধাম

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭২

দ্বন্দ্ব, সমস্যা জর্জরিত জীবনে সমাধানের সন্ধানে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। যখন সব সমাধান হবে, তখন কি হবে? পরমশান্তি লাভ হলে কি হবে? আমরা সমাধানের পথে সবাই যাচ্ছি। আদৌ তৃপ্তি হবে কি না, তাতো কেউ জানছে না। তৃপ্তিকে কেন্দ্র করেই কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি। কিভাবে পরম তৃপ্তি হয়, সেটাই আমরা জানতে চাই.

কোন্ ভরসায় লক্ষ লক্ষ লোক জপ করছে, তপস্যা করছে? স্বাদ যখন তুমি উপলব্ধি করবে, তখনই বুঝবে। দেহের চেতন দিয়ে, মনপ্রাণ দিয়ে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। তোমাদের সাধনা জপ, ধ্যান, নামকীর্তন আপনমনে করে যাবে। যোগ করতে চেষ্টা করতে হয় না। চিরযুগের যোগাযোগে আছ। বেদ বলছে, যোগই হচ্ছে আশা-ভরসা। যোগই টেনে নিচ্ছে সামনের দিকে।

জীব জগতে জন্মগ্রহণই হচ্ছে প্রকৃত সন্ন্যাস। আরও গভীরতা রয়েছে। তোমাদের ভিতরে যে মহান বীজটুকু রয়েছে, ঐটুকুকে জাগাতে হবে। সেটাই সাধনা। সর্বজীবের মধ্যেই এই বীজ আছে। খুব জপ করলে জাগে। আর কর্ম করলে, সৎকর্ম করলে জাগে। সদাসর্বদা নাম করবে উচ্চৈঃস্বরে, আর বীজ মন্ত্রজপ করবে মনে মনে।

তুমি ঘুমোও বুঝে, শিশু ঘুমায় না বুঝে। সর্বক্ষণ ডুবে থাকো মহাসাগরের মধ্যে, সর্বক্ষণ ভরপুর থাকো।

জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত পরম শান্তিরই সাহায্যকারী। রাগ, মান অভিমান, রোগ শোক যা কিছু, এগুলিই হচ্ছে সুফলের ব্যথা। এসবের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে সাধনার পথে। যে যতটুকু করছো, তাই যথেষ্ট।

উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তোমাদের পথ, তোমাদের রাস্তা। সেই পথেই তোমরা রয়েছ। **শিশুর কাছে পাথর, হীরা, নোট কোন কিছুরই দাম নেই। তোমাদেরও হাতে আছে মূল্যবান বস্তু। কিন্তু দাম দিতে পারছো না বলেই দাম না দিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ। মৃত্যুর পরে কোথায় যাবে জানো না। কিন্তু চারিদিক দেখে বুঝে নিয়েছ যে, যেতে হবে।** যদি বুঝতে পারো, 'আমরা চলে যাব।'

কথাটা যদি সম্পূর্ণ মনে প্রাণে গেঁথে নিতে পারো, তবে অনেকদূর উঠে গেলে।

সৃষ্টির নিয়মে বলছে, বেদ বারবার বলছে, তোমরা চিরদিন এখানে বাস করতে আসনি। তোমার অন্য কোথাও থেকে এসেছে। এটা চিরসত্য এবং সকলেরই জানার মধ্যে। একটা পিঁপড়েও জানে। পথটাতো একটাই। **যে পথ দিয়ে আসছি, সেই পথ দিয়েই যেতে হবে। একথা ভালভাবে গ্রহণ করিনি। তাই ভালভাবে বলতে পারিনি। মৃত্যু যে হবে একদিন, সেটা তত মনে লাগে না। যদি লাগতো, তাহলে এত মারামারি হানাহানি থাকতো না।**

আকাশের পথ আমাদের পথ। আমরা এখানে কি গ্রহণ করছি? বাতাস, মাটি, জল। পৃথিবী, আকাশ, মাটি, জল সবই আকাশকে শূন্যকে আশ্রয় করে আছে। আমরাও তাই। আসছো আকাশ থেকে, যাবে আকাশে। আকাশে ঘরবাড়ী আরো সুন্দর।

আকাশের ধ্বনি দুঃখ, ব্যথা, আঘাত। মুক্তির পথে দুঃখে ব্যথায় স্বাদে সোয়াদে কত উপলব্ধি করে করে এগিয়ে যাচ্ছ। চোখে দেখে কত উপলব্ধি করতে পারছো। আমাদের দেহযন্ত্রে এই ইন্দ্রয়গুলো কেন? জানার জন্যই এই যন্ত্রগুলো। অনেক আগে থেকেই যন্ত্রগুলো ঠিকই তৈরী হয়ে যাচ্ছে। সুমিষ্ট সুমধুর গন্ধের কথা জানতো। বহুদূর থেকে ফুলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'চমৎকার' কথাটা স্বাদে সোয়াদে জানা ছিল, তাই বলতে পারছো।

তোমরা সবাই তত্ত্বজ্ঞের যন্ত্র নিয়ে বসে আছো। এখানে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বাহ্যিক বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। গুহ্যতত্ত্বের কথা বুঝতে দিচ্ছে না। কাজ করো বা না করো, কিছু আসে যায় না। এই যন্ত্রই বলে দেবে, অনন্ত সুরের কথা।

তোমাদের ভিতরে অগ্নি থাকা সত্ত্বেও জ্বলছে না। কারণ ভিজে গেছে। কি করে জ্বলবে? কি করে হবে?' 'অসম্ভব', এসব কথায় ভিজে গেছে। কোথায় জট পাকালে বুঝতে পারছো না। তাপ দাও। **শক্তির স্ফূরণ হয় একমাত্র ধ্বনিতে। তত্ত্বের চর্চা, আলাপ, আলোচনা তাপের কাজই করে। নাম কর উচ্চারণ করে করে, তাতেও হয়। মনকে সতেজ রাখতে হবে। তোমাদের ভিতরকার মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত যে ডিম রয়েছে, তাতে 'তা' দাও।** পদ্মফুলের কলি ফুটতে ফুটতে সম্পূর্ণরূপে ফুটে-সুন্দর বের হয়। সর্বদা নাম উচ্চারণ করলে স্ফূরণ হতে বাধ্য।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বসুমতীর প্রতিটি কণা এক একটি পৃথিবী

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস
শিবপুর, হাওড়া
২১শে জুলাই, ১৯৭১

তোমরা ভরপুরে মাঝে ভরপুর হয়ে সুর দিয়ে সুর টেনে নাও। রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথা প্রকৃতির প্রয়োজনেই এগুলি রয়েছে আমাদের মাঝে। মূলাধার, স্বাধিষ্টান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার এই সপ্তচক্রে দেহকে ভাগ করা হয়েছে। মূলাধারের মূলচক্রে আছে নাদধ্বনি। সেই ধ্বনির যন্ত্রকে বাজাও। আলোর ভাণ্ডার চলে আসবে। আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে, সহস্রারে সহস্র সূর্যকে স্মরণ কর। বেদ হচ্ছে আকাশ। বেদ হচ্ছে জ্ঞান, বিচার, বিবেক। বেদ সবার জন্য। আকাশের সাধনাই বেদের সাধনা। মিলনের সুরে মিলিত হওয়াই বেদের সারকথা।

রাধাকৃষ্ণকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে মানচিত্রস্বরূপ। রাধাকে সংসারে আলাদা করে বিচার করবে না। কৃষ্ণ সাধনায় একমাত্র ছিল রাধা। রাধাই ছিল, রাধা হচ্ছে ধারা। অনন্ত বিশ্বের ধারা, যার থেকে অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। ধারা ধারা বারবার বললে রাধা হয়ে যায়। আকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ। মহাশূন্যের থেকে অফুরন্ত সেই সৃষ্টির ধারা বয়ে চলেছে। তাই রাধাকৃষ্ণ অনন্ত যোগসূত্রে সাধা ও গাঁথা। মহাশূন্যের সেই সৃষ্টির ধারা, চৈতন্যের ধারা সমস্ত জীবের মধ্যে লীন হয়ে রয়েছে। ইহাই বেদের সারমর্ম, বেদের সারকথা।

সমস্ত জীবের জীবনের চলার পথে যে সুর, সেটাই বেদের সুর। তোমাদের সত্তায় রয়েছে বেদের সুর, বেদের মর্মের কথা। বেদ আলাদা কিছু নয়। **মন বসাবার কোন প্রয়োজন নেই. মনকে চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত হতে দাও। জপ, ধ্যানে বসলে মন দৌড়াদৌড়ি করে; ক্ষতি নেই। যতই দৌড়ে যাক, গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে। গণ্ডীর কোন শেষ নাই।** স্রষ্টাই দেবদর্শন, মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বাতাস যদি বলতো, আমাকে আটক করে রেখে দাও; বাতাস যদি বসে পড়তে চাইতো, তবে তো সৃষ্টি শেষ। এটা তার প্রসারতা, এটাই তার ধ্যান।

মন বাতাস, সূর্য, গ্রহের চেয়ে অনেক বড়। কি করে তাকে আটকে রাখবে? এভাবেই চলবে। নদীর ঘোলা জলের মাটি নীচে পড়ে পড়ে, জমে জমে নদীতে চর পড়ে যায়। মনের মধ্যে অগণিত পলিমাটির মতো স্তর রয়েছে। বসুমতীর

প্রতিটি কণা এক একটি পৃথিবী। শূন্যের শেষ নাই, মনেরও শেষ নাই। সমস্ত আকাশকে মন বলা হয়। (আমার মত) প্রতিটি কণার মধ্যে একটি বিষ্ণু রয়েছে। কণা হয়ে বিচরণ করছেন বিষ্ণু। প্রতিটি অণু-পরমাণুর ক্ষমতা অসীম। এক বীজে অগণিত ক্ষমতা। এক বীজ হতেই শত সহস্র লক্ষ, কোটি বীজের সৃষ্টি। মনের মাঝে মন হয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছি বীজ আকারে। শত, সহস্র বিষ্ণু তোমাদের মনের মাঝে আছে। তাহলে কেন এই হিংসা-দ্বেষ, বিবাদ-বিচ্ছেদ? আগুনে হাত দেওয়া যায় না। বরফেও হাত দেওয়া যায় না। আমি অসারকে সারে পরিণত করছি। তোমাদের মনের মাঝে নর্দমার ক্লেদ, পঙ্কিলতা আমার শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরি, তারপর বের করি সার। যেটা পরিত্যাজ্য সেটাও গ্রহণ করে যখন ফুটে বের হই, কত সুন্দর সুন্দর ফুল। **এই সমাজে যারা অপাংক্তেয়, অনাদৃত— এরকম লক্ষ লক্ষ সন্তান আমার স্নেহে যত্নে আদরে ভালবাসায় কত সুন্দর হয়ে গেছে।** তারা তাদের মা বাবা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করছে। মনের শিকড় সাধারণতঃ চায় ক্লেদ-পঙ্কিলতা, আঘাত প্রতিঘাত, হীনতম কাজ। সেইসব রস পান করলেও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠা যায়। গাছের শিকড় নর্দমার জল পান করে না? ফুলের মিষ্ট সুবাসে কি নর্দমার গন্ধ পাও?

মন কিভাবে টানে? তোমার বুঝের যন্ত্রে বুঝে নাও। মনের কার্যকলাপ বড়ই অদ্ভুত। মনকে যতখুশী ছেড়ে দাও, যতই যা দাও, যা দরকার সে (মন) টেনে নেবে। **নিমগাছের গোড়ায় যতই চিনি, দুধ দাও, সে (নিমগাছ) তিতা টেনে নেবে। খেজুর গাছ মিষ্টত্ব টানবে। তোমার মনের শিকড় কোন্ বুদ্ধি, মুক্তি, চৈতন্যের স্বাদে সোয়াদে বার হবে, তোমায় ভাবতে হবে না।** নিশ্চিন্ত থাক। বিচলিত হয়ো না। বিচলিত মন খাদ্য খুঁজে বেড়ায়। ঠিক ফুটে বের হবে। যত ক্লেদই টানো না কেন, এই বীজ সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ হয়ে বের হবে। একদিনের শিশুও বোঝে মধু চাটতে হয়।

যে বীজমন্ত্র পেয়েছ, মনে মনে অহর্নিশ জপ করবে। আর সকলে সমবেতভাবে করবে মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। একদিকে নামে সুরে জপে আকাশমুখী হয়ে থাকলেই সমস্ত দেবতাকে খুঁজে পাবে। মূলাধার থেকে সহস্রার অবধি মহানামের যে সুর আছে, দেহবণাযন্ত্রে সেই সুরই ভজ।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ধর্ম বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, অবাস্তব কথা ধর্ম হতে পারে না

সুখচরধাম
১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৬

আমি বলছি, ব্রহ্মসত্য। সত্যের এইরূপ, এই জগৎ, সত্যের প্রকাশ।

আর আপনারা বলছেন, শঙ্করাচার্যের মতকে তুলে ধরে বলছেন, **জগৎ মিথ্যা। তাহলে আপনারা সব মিথ্যার থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। আর আপনাদের যত গ্রন্থ যাবতীয় যা কিছু আজ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সব কিছুই মিথ্যাত্মক দৃষ্টি, মিথ্যা বুদ্ধি, মিথ্যা বস্তু। সেইভাবেই হচ্ছে আপনাদের সব গ্রন্থ। সুতরাং সেই গ্রন্থের বাণীগুলো আমি কি করে সত্য বলে গ্রহণ করবো?** সব পণ্ডিতরা যত মহামহোপাধ্যায়, তর্কতীর্থ; বেদান্তবাগীশ, পঞ্চতীর্থ, সপ্ততীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, ন্যায়রত্ন, ইত্যাদি পণ্ডিতগণ একেবারে চুপ। সপ্ততীর্থ বলে, বাবা, দিছ একখান বৈড়ার চাল।

আমি বলি, বৈড়ার চাল নয়। এর উত্তরটা দিন। তারপর আমি কথা বলবো। মিথ্যাবাদীর সাথে আমি কথা বলতে রাজী নই। যারা মিথ্যা বস্তু দিয়ে নিজেদের চিন্তা করে রাখছে, তারা মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কি বলুন? সব পণ্ডিতরা মাথা হেঁট করেছে একটা কথায়। আমি বেশী কথা বলতে যাই নাই।

তারপরে রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই যে কথাটা, তাতে আছে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি। একটা জলপূর্ণ কাঁচের গ্লাসে জবাফুল রাখলে জলটা জবাময় হয়। অর্থাৎ লাল দেখা যায়। তাহলে কাঁচের গ্লাসের জলটা কি লাল?

আমি বলি, লাল নয়।

— এটা যেরকম মিথ্যা; জবাটা সত্য। এরকম জগৎটা মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। এটাই বুঝাইতেছে আমারে।

আমি বলি, খুব বুঝাইছেন।

— রজ্জুতে সর্পভ্রম। অন্ধকারে দড়ি পরে আছে, সর্পভ্রম করছে। সাপ হতে পারে। লণ্ঠন আনা হল, লাঠি আনা হ'ল। পরে দেখা গেল, সাপ নয়,

দড়ি। সাপ মিথ্যা।

আমি বলি, ঠিক আছে। আপনাদের কথা হয়েছে?

— হ্যাঁ।

আমার কথা হ'ল, সর্প আছে বলেই রজ্জুতে ভ্রমাত্মক দৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। সেটা বুদ্ধিমানের কথা। অন্ধকারে রুজ্জু (দড়ি) দেখে যদি সর্পভ্রম না আসতো, তাহলে বুঝবো, হয় বোকা নয় পাগল। বললাম তো, মেসোমশাইরা (শ্রীশ্রী ঠাকুরের মেসোমশাই— কৃষ্ণপ্রসন্ন সপ্ততীর্থ— ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সমবয়সী বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁদের উদ্দেশ্যেই 'মেসোমশাইরা' বলেছেন।) যদি ভ্রমটা আসে, এটা তো বুদ্ধিমানের কাজ। ভ্রম হওয়া উচিত। দড়ি না হয়ে সাপও তো হতে পারে। আবার দড়িও হতে পারে। কিন্তু আমার ভিতরে ভ্রমটা আসছে কেন? সর্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে বলেই দড়ি দেখে আমার ভ্রমটা সৃষ্টি হয়েছে। সর্প সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কি মিথ্যা? কথাটা বুঝতে পেরেছেন?

— তাঁরা বলেন, হ্যাঁ তাতো ঠিকই।

আমি বলি, তবে কেন আপনি আমাকে ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে রজ্জুতে সর্পভ্রম, একথা বললেন? কেন বললেন আপনি আমাকে? সুতরাং আপনি ব্রহ্মের রজ্জু দেইখা জগৎটাকে মিথ্যা সর্পের মত মনে করছেন? **ব্রহ্ম কি রজ্জু? ব্রহ্মের সর্প দেখেছেন আপনি? আর এখানে দড়িতে (রজ্জুতে) সর্পভ্রম করছেন? যদি ব্রহ্মের সর্প দেখে থাকেন, তবে ভ্রম হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। যার এই ভ্রম থাকবে না, সে তো নির্বোধ। ভ্রম থাকে না কার? শিশুর ভ্রম থাকে না।** একটি শিশু, তার কাছে দড়িও যা, সাপও তাই। সাপকে সে ধরতে গেছে। তাহলে বলা যায়, শিশুর এই ভ্রম হতে পারে। কারণ তার সর্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, দড়ি সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা নাই। দড়ির মত পইরা আছে। সে খপ্ কইরা ধরতে গেছে। সেটা দড়িও হতে পারে, সাপও হতে পারে। ধরার পরে কি হবে, তা তার জানা নাই। কারণ তার অভিজ্ঞতাই নাই। ছোট শিশু। তার সাপও খেয়াল নাই, দড়িও খেয়াল নাই। আর আমার বাচ্চা বয়স থেকে সর্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, জবাফুল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, রজ্জু (দড়ি) সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং ভ্রম যার

হবে না, সে নির্বোধ। শঙ্করাচার্য যদি বলে থাকেন, রুজ্জুতে সর্পভ্রমের মত মিথ্যাত্মক বুদ্ধিতে জগৎমিথ্যা, তাহলে বলবো, তিনি গুটির খেলাই খেলেছেন, মিলাতে চান নি। কি পণ্ডিত মশাইরা, উত্তর দিন.

তাঁরা (পণ্ডিতগণ) — না, আর উত্তর দেব কি। ঠিকই তো। ভ্রম না হলে আমরা মূর্খই বলতাম। নাহলে বলতাম পাগল। দড়ি দেখে সাপ ভাবা উচিত, প্রত্যেকেরই উচিত। অন্ধকারে দড়ি দেখে যারা সাপ ভাববে না, তারা মূর্খ। দড়ি না হয়ে সাপও তো হতে পারে। না, তোমার এই কথার জবাব নাই। তোমার উত্তর ফেলতে পারি না।

আমি (শ্রীশ্রী ঠাকুর) — শুনেছি, শঙ্করাচার্য কাম শিক্ষার জন্য কায়া (দেহ) পরিবর্ত্তন করেছিলেন। তিনি একজন কাপুরুষ ছিলেন, আমি বললাম। আমার Mathematics বলছে, শঙ্করাচার্য একজন কাপুরুষ ছিলেন। আমার আদর্শ, আমার দর্শন Mathemaics-এর উপরে, গণিতের উপরে, বিজ্ঞানের উপরে। আমি বলবো, তিনি কায়া বদল করে নিজেকে ঢেকে গেছেন। কায়াবদল করে তিনি কি প্রমাণ করতে চাইতেছেন? তিনি (শঙ্করাচার্য) নিজেকে ফাঁকি দিয়েছেন এবং কামসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। এমনি দেখালে তাঁকে কামুক বলা হবে; তিনি সঙ্গম করেছেন, নারীর সাথে সঙ্গম করেছেন এইটা প্রমাণ হয়ে যাবে; তাই তিনি সেটাকে আরেকভাবে বুঝাতে গিয়া আরেকজনের কায়ায় ঢুইকা (ঢুকে) গিয়া এই উপলব্ধিগুলো করেছেন। যাঁরা এইরকম করেন তাঁরা কামশস্ত্র শিখবার উপযুক্ত নয়। **কামশাস্ত্র কাউকে শিখতে হয় না। একটা টুনটুনি পাখীকে কোন্ কাম শিক্ষার স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিল? কুকুর বিড়ালরে কোন্ কামের স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিল? এই যে আজ পর্যন্ত বালবাচ্চারা জন্ম নিচ্ছে, কেউ কাউরে ট্রেনিং দিয়েছিল? কামশাস্ত্র প্রকৃতির আপনসুরে গাঁথা।** ইহা প্রকৃতির মহাদান। তিনি (শঙ্করাচার্য) সেটা শিখতে গিয়া কায়া বদল করলেন কেন? একটা পাখী যা জানে, একটা কুকুর বিড়াল যা জানে, তাঁর সে অভিজ্ঞতা ছিল না? অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য এইরকম বেশ পরতে গেলেন কেন? এতবড় পণ্ডিত তিনি, এই কাজটা কি ঠিক করেছেন? আমাকে তার জবাব দিন।

আমি কামের দরজায় যাব না, সেটা আলাদা কথা। আমি বিবাহ করবো না, সেটা আলাদা কথা, আমি নারীর সাথে মিশবো না, সেটা আলাদা

কথা। তারজন্য তোমার কাম নাই, একথা তুমি বলতে পারো? কামত্যাগ করেছে, এরকম পরুষ আছে? কামত্যাগ করতে পেরেছে, এরকম ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে? আজ ৫০০ কোটি, ৬০০ কোটি পৃথিবীর বয়স, হলো, বলতে পারবে, কেউ কামত্যাগ করেছে? 'ত্যাগ করেছে', কথাটাই তো তার অভিজ্ঞতা সূচিত করে। যার আছে, সে ত্যাগ করেছে। তুমি যদি বল, 'আমি কাম ত্যাগ করেছি', তার অর্থ কি? তোমার কাম ছিল। তুমি ত্যাগ করেছ, এটা মুখে বলছো। ত্যাগ হয়েছে না হয়েছে, পরবর্ত্তী কথা। কথাটাতো সেই, 'আমি ত্যাগ করেছি'। 'ত্যাগ করেছি' কথাটা কেন আসছে তোমার? 'ছিল' বলেই একথা বলতে পেরেছ। 'নাই' একথা বলতে পারলে না। কাম ত্যাগ হয় না। কামনাই কাম।

বড় বড় সব পণ্ডিতরা বসে আছেন আমার সামনে। আমার কথা শুনে কারও মুখে আর কোন শব্দ নাই।

আমি বললাম, আমি লজ্জা ত্যাগ করেই কথা বলছি। আপনারা আমার বাবার চেয়েও বড়। একজন মহা মহোপাধ্যায়কে বললাম, আপনি তো শিবলিঙ্গ পূজা করেন। আমি লজ্জা ত্যাগ করেই কথা বলছি। মাপ করবেন, বলুন তো, লিঙ্গ কয়টা? একটা ব্যক্তির লিঙ্গ কয়টা? আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, বুঝতে পেরেছ? একটা ব্যক্তির লিঙ্গ কয়টা? বলুন, উত্তর দিন আপনারা।

সব পণ্ডিতরা বলে, এ্যাঁ? লিঙ্গ তো একটাই থাকে। মূত্রলিঙ্গ। শিবলিঙ্গ দিয়েই সবাই বলছে।

আমি বললাম, না। লিঙ্গ হচ্ছে সমস্ত দেহটা। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই হচ্ছে লিঙ্গ।

সপ্ততীর্থ যিনি ছিলেন, হাঁ কইরা আমার দিকে টলটল কইরা (ক'রে) তাকাইয়া রইছে, 'কি বললে?'

আমি বলি, চক্ষু এক লিঙ্গ, কর্ণ এক লিঙ্গ, নাসিকা (ঘ্রাণ) এক লিঙ্গ, জিহ্বা এক লিঙ্গ ও ত্বক (স্পর্শেন্দ্রিয়) এক লিঙ্গ।

যার মধ্যে তৃপ্তি আছে, সেটাই কাম। Satisfaction-ই হ'ল কাম। বুঝতে পেরেছেন? যার মধ্যে satisfaction আছে, সেটাই কাম। চোখে

দেখে তৃপ্তি, এইটা কাম। কানে শুনে তৃপ্তি, এইটা কাম। ঘ্রাণ অর্থাৎ শুঁকে তৃপ্তি, এইটা কাম। জিহ্বায় স্বাদ নিয়া তৃপ্তি, এইটা কাম। আর লিঙ্গ সঙ্গমে তৃপ্তি, সেইটা কাম। বুঝতে পেরেছেন?

সব পণ্ডিতরা চুপ। কারও মুখে কোন কথা নাই। বুঝছোস্? ব্যাটা বোঝোস্ তো নাকি? কি কইতাছি, বুঝছোস্ তো? বেদমন্ত্র .....।

Scientist সত্যেন বোস, নাম শুনেছ? সে এসে বসে থাকতো আমার কাছে। আমার কাছে তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতো। আর একজন আসতো M.N. Roy (মানবেন্দ্র নাথ রায়), নাম শুনেছ? সে আসতো আমার কাছে। M.N. Roy তো অবাক হয়ে গেল গিয়া এই তত্ত্ব শুনে। আপনি বলছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই লিঙ্গ? এক, same?

আমি বলি, same. একমন তুলা আর একমন লোহা। তুলার চেহারা দেখে কি বলবে, তুলার ওজনটা বেশী একমণের থেকে? একমণ লোহা, একটা লোহার চাকা, একটা লোহার পিণ্ড হতে পারে। আর একমণ তুলা, একটা বিরাট তুলার বস্তা হতে পারে। কিন্তু weight টাতো সমান। সুতরাং চোখে দেখে তৃপ্তি, আর সঙ্গমে তৃপ্তি— দুটোই সমান। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই কাম।

সপ্ততীর্থ বললেন, হ্যাঁ। বাবা, এটা খুবই আশ্চর্য। লিঙ্গ তো সবটাই দেখতে পাচ্ছি। চক্ষুও লিঙ্গ, কানটাও লিঙ্গ, নাকটাও লিঙ্গ, জিহ্বাও লিঙ্গ।

আমি বলি, ত্বকের মধ্যে টিপলে অনেক সময় আরাম লাগে না? লাগে? আরাম লাগে কি না? আরামটাই তো তৃপ্তি। 'আমার পিঠটা টিপা দে', কও না? 'Massage কইরা দে', বলো না? সবটাই কিন্তু লিঙ্গবৎ। Full Satisfaction। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছ, ভোগ করছো। ভোগই হচ্ছে কাম। কাম হচ্ছে যোগ। যোগাযোগই কাম। ভগবানকে ডাকাও কাম।

— এ্যাঁ? একজন পণ্ডিত বলে, ভগবানকে ডাকাও কাম?

আমি বলি, **তোমরা কৃষ্ণ গুণগান করো। রাধাকৃষ্ণের মিলনের গান গেয়ে একেবারে মুগ্ধ থাকো। লক্ষ্মী নারায়ণের গান গেয়ে মুগ্ধ থাকো। তাগো (তাদের) মধ্যে প্রেমের গান আছে না? কোন্‌টা না পাইছো (পেয়েছ)? ঘরের কথা, পিছনে পিছনে প্রেম, সবই আছে তাতে। সেইগুলি ভাল লাগে না শুনতে? রাধার প্রেম বইলা (ব'লে) বুঝি আলাদা? এ্যাঁ?**

কৃষ্ণের প্রেম আলাদা? আর তোমার প্রেম বুঝি এখানে আলাদা? প্রেম সবই এক। এক কোষ জল সমুদ্র না হতে পারে, সমুদ্রের সমতুল্য। এককোষ জল তো আছে তোমার। সীমা খুঁজে পাওয়া যায়। সমুদ্রেরইতো জল। তোমার প্রেমটা বুঝি এককোষ? আর ওদেরটা বিশাল? ওগুলি সব মানুষের ধারণার কথা। প্রেম একসুরে, সমসুরে গাঁথা।

তারপরে পণ্ডিতদের সব ভাল কইরা (করে) বুঝাইয়া দিলাম। লিঙ্গ বুঝাইয়া দিলাম। কাম দেখাইয়া (দেখিয়ে) দিলাম। আর ultimate বললাম, বস্তুবাদের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। কাম সম্পর্কে অনেকক্ষণ আলাপ করেছি। তোমাদের অল্পবিস্তর বললাম। ব্রহ্ম দেখাইয়া দিলাম। বস্তু দেখাইয়া দিলাম। তারপর ধর্ম সম্বন্ধে বললাম। ধর্ম বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবাস্তব কথা ধর্ম হতে পারে না। এটা proved. এটা Mathematics. আর আমাদের দেশে বেশীরভাগই ধর্মের কথা হ'ল, অবাস্তব কথা আর কল্পনার কথা।

পণ্ডিতরা সবাই আমারে খুব তারিফ করলো। আমারে একেবারে জড়াইয়া ধরলো, 'না রে বাবা, সত্যই তুমি জন্মগত যে সুরটা নিয়ে এসেছ, আমরা একটা নতুন আলো খুঁজে পেলাম। এতটা চিন্তা আমরা করিনি। আমরা জানতাম, **কাম, ক্রোধ, লোভ — এগুলো ত্যাগ না করলে দেবদর্শন হয় না। দেবদর্শনও যে একটা কাম, এটা বুঝিনি। সুতরাং কামত্যাগ না করলে দেবদর্শন হয় না, একথা সর্বৈব মিথ্যা।'**

তখন আমি বললাম, পৃথিবীতে কারও তাহলে দেবদর্শন হয় না। কারণ কেউ কামত্যাগ করতে পারেনি, পারবে না। সেটা নিয়ে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে পৃথিবীতে কারোরই দেবদর্শন হয় না। সব fail. Ultimatum দিয়া আমি চলে আসছি। আপনাদের কাউকে আঘাত দিয়ে আমি কথা বলছি না। আমার Mathematics-এ fraction করলাম। কাটাকাটি করে, অঙ্ক করে সব করে result = এত বসিয়ে দিয়ে, লিখে দিয়ে বলে গেলাম। এখন আপনারা মিলান (মিলিয়ে দেখুন)। যার সাথে প্রয়োজন মিলিয়ে দেখবেন। কে ভগবান পাইল (পেল) না পাইল, কে কামত্যাগ করলো না করলো, এখন মিলান গিয়া বইসা (বসে) আপনারা। আমি কেন মিলাতে যাব? আপনারা মিলান।

আমাকে একজন বলে, অমুকে ত্যাগ করেনি? নাম ধরে আমাকে

বলছে।

আমি বলি, আমার সামনে কারও নাম বলবেন না। আমি কারও sentiment-এ আঘাত দিতে রাজী নই। আমি আমার Mathematics তুলে ধরলাম। আমার Mathematics যদি ভুল হয়, সংশোধন করে দেবেন। আমি সে ভুল মাথা পেতে নেব। আমি বাচ্চা বয়স থেকে অঙ্ক কষতাছি (কষছি)। Universe-এর অঙ্ক কষি আমি। সুতরাং আমি যে অঙ্ক কইষা (কষে) গেলাম, সেখানে যদি ভুল দেখান, আমি সশ্রদ্ধভাবে সম্মান দিয়েই গ্রহণ করবো। তাতে আমার অপমান হবে না। আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করবো যে, আমার ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আপনাদের ভুল যেখানে; **আপনারা যেখানে ভুল কথাবার্ত্তা বলছেন, সে ভুলের ফলে আপনাদের অঙ্কে মিলছে না। অঙ্কের ফল মিলছে না। গণিত ভুল করলে তো মানা যায় না। আপনারা ৩x৫=১৮ বলবেন; আমি ৩x৫=১৫ বলবো। আপনারা ৩x৫=১৮ বললে, আমি কি করে মেনে নেব বলুন? আমি চুপ করে যাব গিয়া। আপনারা বকতে পারেন। বকার (বকুনির) ডরে (ভয়ে) আমি চুপ করে থাকতে পারি। কিন্তু আমি খাতায় যখন লিখবো, আপনাদের ভুলটা আমি জানিয়ে দিয়েই যাব।** আমার Mathematics-এ যে result আসবে, আমি সেটাই বলবো। বেদমন্ত্র .....।

আপনাদের যে দেশের ভগবান কামত্যাগ না করলে পাওয়া যায় না, আমার কথাতে সেই দেশের লোকেদের কোনদিনই ভগবান দর্শন হয়নি, হতে পারে না। কামত্যাগের এই ভুয়া (মিথ্যা) কথা বলে তারা সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। একথা correct কি না বল? কি উত্তর দাও? একথা মেনে নিতে বাধ্য কি না বল? পৃথিবীতে কোথাও কেউ কামত্যাগ করে নাই।

কামত্যাগ করে নাই তোমাদের কৃষ্ণ। কামত্যাগ করে নাই বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের বাচ্চাটা ভুলে হইয়া গেছিল গিয়া (হয়ে গেছিল গিয়ে)। যদি বাচ্চাটা না হইত (হ'তো), তাহলে কইতো, বুদ্ধদেব এর মধ্যে যায় নাই। একথা বলতো কি না বল? এ্যাঁ? কামত্যাগ করে নাই শ্রীরামচন্দ্র। এইবার তোমাদের দেবতাগো নাম কইতাছি। অন্য কারও কথা বলছি না। **দেবাদিদেব মহাদেব, স্বয়ং মহাদেব, তাঁরও বাচ্চা আছে। সবারই তো বাচ্চা আছে। কাম তো কেউ ত্যাগ করে নাই। কোন্ মহাপুরুষ, কামত্যাগ করছে? হালে যত**

মহাপুরুষ আছে, বুদ্ধকে সবাই মানে। বুদ্ধদেবের তো একটা বাচ্চা হইয়া গেছে গিয়া। ফ্যাট্‌কা তালে পইরা (পরে) গেছে। তা না হ'লে আমাদের দেশের লোকেরা বলতো, 'তিনি (বুদ্ধদেব) এর মধ্যে যান নাই।' বলতো কি না বল? বেদমন্ত্র .....। **বুদ্ধদেবের বাচ্চা হইয়া গেলেও, যদি দেবতা হইতে পারে, তবে কামত্যাগ না হইলে দেবদর্শন হয় না, একথা কি ঠিক?** আমার অঙ্কে কিন্তু বলছে, bogus কিন্তু না; সব ৩x৫=১৮। কাগজে কলমে, Mathematics-এ, বিজ্ঞানে, শাস্ত্রে যুক্তিতে যদি না বনে (মেলে), কি করে মেনে নিই বল? আমার বিজ্ঞান ভুল বল, আমার অঙ্কে ভুল দেখাও।

আমি বলেছি, সমস্ত সপ্ততীর্থ, পঞ্চতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থদের ডাক। আমার কথার উত্তর দাও। সেখানে ৩০/৪০ জন বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমি হাতজোড় করে কথা বলেছি। আমার বাচ্চা বয়স; আমাকে জবাব দাও। আমি সমস্ত শাস্ত্রের সারটুকুনু নেব। বসে বসে তোমাদের মত ঐরকম করতে রাজী নই। আমি fraction করবো। কাটাকাটি করে দেখবো, result=1 or (অথবা) O (শূন্য). Result I হতে পারে, আবার O(শূন্য)-ও হতে পারে। কোন্‌টা তোমাদের ফল হয়েছে দেখি। ফলে দেখি, ৫, ৭, ৩, ৪, ২, ১ উত্তরের কাছ দিয়াই নাই। কোনটার উত্তর মেলে না। একটারও উত্তর কাছ দিয়াই নাই। তাদের তর্কাতর্কি সব শিখাতে (টিকিতে) বান্ধা (বাঁধা), আর নামাবলীতে বান্ধা। আগো বেদবেদান্ত বেশীরভাগই নামাবলী আর উপাধিতে বাঁধা— আর কিচ্ছু না। অমুক মহামহোপাধ্যায়, অমুক বৈদান্তিক, অমুক বেদান্ততীর্থ, অমুক পঞ্চতীর্থ, অমুক সপ্ততীর্থ— এগুলিতে, এইসব উপাধিগুলিতে গাঁথা আছে। আর শিখাতে বাঁধা আছে আর কিচ্ছু না। আর আমি একখানা সাধারণ চাদর পরণে, বাচ্চা থিকাই পরতাছি, বাবা কিনে দিতেন। চহির আনা (৪ আনা) পাঁচ আনা দাম, এক একটা ছোট চাদর। কখনও বা ২ আনা দাম। পরে ৭ টাকা, ৮ টাকা, ৯ টাকা, ১০ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছে। শুধু চাদর পইরাই কাটাইয়া (কাটিয়ে) দিলাম। আমি কি পোষাক কিনতে পারিনা? ধর্মের নামে ব্যবসা করলে অনেক দামী দামী পোষাক কিনতে পারতাম। ধর্মের ব্যবসা করুম কারে দিয়া? সব ফাঁকির গুড়া দিয়া ব্যবসা।

ধর্মটা এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু ফাঁকির গুড়া। আর কিছু নাই। সব শুদ্ধি আর মুক্তি— শুধু কথা, কিছু নাই। সব গল্‌তি আর গল্‌তি। কিচ্ছু নাই,

সব ফাঁকা। একেবারে অপারেশনের টেবিলের উপর রাইখা (রেখে) খ্যাচ্ খ্যাচ্ কইরা কইটা (কেটে) ছাইড়া দিচ্ছি। তারপর সিলি (সেলাই) কইরা দিচ্ছি। O.T.-তে নিয়া গেছি সবগুলিরে। সব O.T.-তে নিয়া গেছি। বুঝলা কথাটা?

আমি তো এখানে ঠাকুর সাজতে যাই নাই। ভগবান সাজতেও যাই না। তোমাদের সাধারণ ঘরের ছেলেদের মতোই তোমাদের একজন হয়ে রয়েছি আমি। আমার ৫ বছর বয়স থেকে এইভাবে চলছি আমি। ৫ বছর ৩ মাস বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি, মন্ত্র দিচ্ছি, সবই করছি। ঐ বাচ্চা বয়সেই তোমাদের (আশেপাশে) সব কাজ করে গিয়েছি। আমি কি নাম কুড়াতে গেছি? এই জন্যই তো সবাই বলতো 'বালক ঠাকুর', 'বালক গোঁসাই'। ইস্কুলে পড়বো কি? মাষ্টাররা সব দীক্ষা নিয়া ফেলাইছে (ফেলেছে)। স্কুলের মাষ্টাররা দীক্ষা নিচ্ছে। আজও মাষ্টাররা কেউ কেউ আসেন। অনেকে দেখেছে। **হাজার হাজার লোক দেখেছে, ছাত্র মাষ্টারের পায়ে পড়ে। মাষ্টার আবার ছাত্রের পায়ে পড়ে। গুরু-শিষ্য দুজনে দুজনকে প্রণাম করতে শুরু করেছে; কি চমৎকার।**

আমি বলি, 'কি মাষ্টার মশায়, আপনি আমাকে প্রণাম করছেন কেন? আমি আপনাকে প্রণাম করবো।'

তিনি বলেন, 'না না। তুমি আমারে দীক্ষা দাও।'

দীক্ষা দিলাম। শেষ বেলা কয় কি, 'তুমি আমারে মাষ্টার ডাকবা না। তুমি আমার পরপারের কাণ্ডারী। তুমি আমার নারায়ণ।'

সে কথা কয় না আমার লগে। পরোক্ষে সম্বোধন কইরা (করে) কথা কয়। আমারে বলে, 'কবে যাওয়া হবে?' কি যন্ত্রণা। আমি আবার বলি, 'কবে আসা হবে?' এইরকম ব্যাপার চলছে। বেশ। হা-হা-হা-হা-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমরা গুরুগত প্রাণ হয়ে সব সুরকে একসুরে বাঁধ

শ্যামবাজার, কোলকাতা
১২ই অক্টোবর, ১৯৬৯

দেবর্ষি আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করে বেদের বর্ণনা করতে শুরু করলেন। সেখানে সব অবতার শ্রেণীর ঋষি মহানরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা সিদ্ধি, মুক্তি, অনুভূতি কেমন করে হবে? কোথা থেকে কেমন করে জানবো? আমাদের ডাক পৌঁছে কি না কেমন করে বুঝবো? জপধ্যান করছি, ঠিক করছি কি না, বুঝতে যে পারছি না।

শিব বলছেন, অর্থ বুঝ বা না বুঝ, এই বাণীতেই রাম নারায়ণ রাম ধ্বনিতেই মুক্তি হয়। **সৃষ্টিতত্ত্বে কেমন করে সৃষ্টি হ'ল ভেবেছ কি? সৃষ্টিতত্ত্বে প্রতিটি বস্তু যেমন করে হয়, ঠিক তেমন করে তোমাদের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ হবে। প্রতিটি ডাকের মূল্য সুদে আসলে পাবে।** অনেকেই প্রথমে মন দিয়ে জপধ্যান করতে পারে না। কিন্তু প্রতিটি ডাক বিশ্বের দরবারে গিয়ে পৌঁছাবে।

প্রকৃতি বলছেন, তোমার কথা তুমি যদি শুনতে পাও, তোমাকে যখন দেখতে পাও, যখনই তুমি চিন্তা করছো, আমার বিশ্বের জল, বাতাসের সাহায্য নিচ্ছ। যেখানে পৌঁছে দেবার কথা, তারা সেখানে পৌঁছে দিচ্ছে। বিশ্বের সমস্ত বিষয়বস্তুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যার যেখানে যাবার চলে যাচ্ছে। নিয়মই হোল সবকিছু। টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় যেখানে টেনে নেওয়ার জন্য অনন্ত জগৎ তৈরী হচ্ছে। **তোমার ডাক, তোমার শব্দ, তোমার ধ্বনি তুমি শুনতে পাচ্ছ, আর অনন্ত বিশ্বের স্রষ্টা শুনতে পাবেন না, এটা কি হতে পারে?** তোমার চেতন মনে সচেতন যিনি, যাঁর কাছ থেকে তুমি সচেতনের সুর ও সাড়া পেয়েছ, যাঁর কাছ থেকে তুমি রোজগার করছো, তিনি তোমার থেকে অনন্ত গুণে ধনী, এটা তো মানো। তাঁর গড়াতে তুমি গড়া,

তাঁর ধ্বনিতে তোমার ধ্বনি; তাই তাঁর ধনে, তাঁর সম্পদে তুমি ধনী। বাবাকে জিজ্ঞাসা করছো, 'ঠাকুর্দা কে ছিলেন?' বাবা যখন আছেন, ঠাকুর্দা তো ছিলেনই।

ঋষি জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর (স্রষ্টার) কাছে যদি আমাদের ডাক পৌঁছে, তবে আমাদের মধ্যে কোন সম্পন্দন আসছে না কেন? সাড়া পাচ্ছি না কেন? বেদ বলছেন, মনেপ্রাণে তুমি সাধনা করে যাচ্ছ। সাড়া আসছে কি না আপনি জানতে পারবে। জানার পথের পথিক, তুমি জানতে জানতে যাও। আপনি তোমার মাঝে সুরের স্ফূরণ হবে। তোমার ভিতরের তাপ, সে কি তোমার? না, সূর্যের? কত কোটি মাইল দূর থেকে সূর্য তাপ বিকিরণ করছেন। আমাদের দেহে নাড়ী যে চলছে, এই স্পন্দন করে অন্তরের বাণী বলবো বলতো? এটাও কোথা থেকে আসছে? সূর্যের ভিতরে যে স্পন্দন চলছে, এটা তারই মাত্রামাফিক ধ্বনি। **আমরা বসে, দাঁড়িয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি আর ফেলছি, কোথা থেকে আসছে এই বাতাস? কোথা থেকে বইছে? কেউ যেন আমাদের সাথে সাথে টানছে আর নিচ্ছে আর ফেলছে। আমাদের সাথে অনন্ত যোগ সূত্রের যোগাযোগ আছে।**

অবিরাম চলার মধ্য দিয়ে বুঝছো, কেউ আমাদের সাথে সাথে টানছে। তেষ্টা আসবে বলেই নদী, খাল-বিল আগে থেকেই ভরে রেখে দিয়েছে। প্রকৃতির মাঝে প্রতিটি বস্তুই যেন একটা সুরে বাঁধা রয়েছে। প্রতিটি বস্তুর মাঝেই একটা যোগাযোগ আছে। তোমার দেহ মন প্রাণ সব সেই যোগাযোগে রয়েছে। জল বাতাস মাটি থেকে তোমার চেতন, তোমার চৈতন্য। সৃষ্টির অনন্ত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণে মিলনের সুরে মাত্রামাফিক মাত্রা দিয়ে তোমার জীবন, আমার জীবন। তোমার মধ্যে যে প্রাণ আছে, জল, বাতাস, মাটিতে প্রাণ আছে। তাদের চৈতন্য আছে বলেই তোমার চৈতন্য আছে।

ডিমকে কথা বলাতে হলে, পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে 'তা' দিতে হবে। এর মধ্যে যে প্রাণ আছে, নাড়াচাড়া করলে বোঝা যায় না। 'তা' দিলে তার থেকে এত সুন্দর পাখা, এত সুন্দর রং নিয়ে ময়ূর বের হয়ে এল।ঐ যে মহাকাশের মহাশূন্যের সুর, ধ্বনি, নাদ, তাকে যেভাবেই বল না কেন, 'তা' দেবার মত হলে, আপনি ফুটতে থাকবে। তোমার সাড়া যে বিশ্বের দরবারে

পৌঁছে, তখন বুঝতে পারবে। এখন বোঝার দরকার নেই। বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। তুমি সুরে থাক। বেদের মন্ত্র স্মরণ কর। তোমার ক্লেদ পঙ্কিলতা আপনি নষ্ট হয়ে যাবে। তোমাদের ভাবতে হবে না। শুধু মন্ত্র জপ করে যেও। আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

মিলনের গীতিতে রাখাল কৃষ্ণ এলেন, রাধা এলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন সুর বাঁধলেন। প্রেমের মধ্যে রস থাকা চাই। প্রেম ছাড়া গতি নেই। এই যে মিলন, কামনার সাথে প্রেমের সাথে একত্র করে উন্মাদনা সৃষ্টি হলো। সেই উন্মাদনায় সমস্ত জগৎকে রাধার সাথে মিশালেন। প্রকৃতি পুরুষের মিলনের সুরে যুক্ত শিব ও শক্তিকে একই সুরে গাঁথলেন। তোমরা গুরুগত প্রাণ হয়ে সব সুরকে এক সুরে বাঁধ।

দেবর্ষি নারদ দেহবীণাযন্ত্র বাজাতে সুরু করলেন। আজ্ঞাচক্রে দেখলেন শুধু আলো, সমস্ত দিক আলোময়। সহস্রারে (মস্তকে) সহস্র সূর্যের জ্যোতিতে জ্যোতিলোকের সৃষ্টি। তিনি সহস্রারকে মূলাধার করে বাজাতে বাজাতে আবার সহস্রারে পৌঁছলেন। সেখানে শিবশম্ভু যন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। তিনিও সহস্রাকে মূলাধার করে ক্রমে ক্রমে সহস্রারে চলে গেলেন। সাধারণের মাঝে এই অসাধারণ সুরকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। তাই তোমরা বুঝে না বুঝে এই দেহবীণাযন্ত্র বাজাও, এতেই তোমাদের সিদ্ধি মুক্তি, নির্বান হবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শুধু শাস্ত্র গ্রন্থ, প্রেমের গ্রন্থই গ্রন্থ নয়। প্রকৃতির গ্রন্থ, প্রকৃতির তত্ত্বদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে

২৮, শরৎ বোস রোড, কোলকাতা - ২০
২রা আগষ্ট, ১৯৬৭

মহাশূন্যের ধ্যানে যখন তন্ময় হয়ে যাবে, তোমার বোল তখন বলীয়ান হয়ে যাবে। মহাশূন্যের সুরে সাথে জীবের সুর একমাত্রাতে চলে যাবে। জীব তখন বুঝতে পারবে যে, তার সুর আর মহাকাশের মহাশূন্যের চৈতন্যের সুর একই সুরে একই মাত্রাতে রয়েছে। এই বোধ যাতে সত্যিকারের বোধে আসে, তারজন্যই তো যাবতীয় সাধনা। এটা যখন ঠিক ঠিক বোধে আসবে, তখন জীব নিজেই হয়ে যাবে জাগ্রত সুর। অনন্ত বিশ্বের যাবতীয় শক্তি তখন তার শক্তি হয়ে যাবে। অণিমা, লঘিমা, অন্তর্যামিত্ব ও সর্বব্যাপ্তমানতা, সবই সেদিন তার আয়ত্তে এসে যাবে। এটা সহজে হয় শূন্য ধ্যানে। শূন্য ধ্যানে মগ্ন হলে তবেই সকল শক্তি তোমার আয়ত্তে আসবে। তুমি যে বিশ্বময় ব্যাপ্তমান হয়ে রয়েছো, সেটা তখন ঠিক ঠিক উপলব্ধিতে এসে যাবে। তারজন্যই তো সাধনা।

এই সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করতে চান যারা, তাদের সঠিকভাবে জানতে হবে, কেন সাধনা করতে হয়; কিভাবে করতে হয়। সেইপথ প্রকৃতির নিয়মের ভিতরেই ন্যস্ত। সুতরাং **সাধনার পথ পদ্ধতি যখন প্রকৃতির নিয়মের মাঝেই আছে, সেটা আলাদাভাবে তৈরী করা কোন জিনিস নয়। সেটা সৃষ্টির সাথে সাথে সৃষ্টির নিয়মের মাঝেই ন্যস্ত হয়ে রয়েছে। অনেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাধনা করছে। নিয়মের মধ্য দিয়ে কত কঠিন কঠিন যোগ, প্রাণায়াম করছে। সেগুলি সবসময় আমাদের সংসারে থেকে চর্চা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সংসারে থেকে সাধনার ক্ষেত্রে সম্ভব যা নয়, সে সম্পর্কে অসম্ভব বলে সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করাও উচিত নয়।** অমুকভাবে সাধনা করতে হবে, সংসার ত্যাগ করে সাধনা করতে হবে ইত্যাদি নানারকম কথা শুনতে পাওয়া যায়। সাধারণ যে নিয়মকানুন আছে, জন্মের

সাথে যখন মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে, জন্মের সাথে সাথে জন্মগত সুরকে কিভাবে সুরে আনা যায়, তারও সন্ধান জন্মের সাথেই রয়েছে। জন্মের আগে কোথায় ছিলে, কিভাবে ছিলে, যদিও এমনি জানা যায় না; জানার পক্ষে অসুবিধা; তবে তা জানার মধ্যেই রয়েছে। সেই পথ পদ্ধতি সাধারণ এই দেহের মধ্যেই ন্যস্ত আছে। কোথায় ছিলাম, কোথায় যাবো? শুধু মুখের কথায় এই জিজ্ঞাসার সমাধান হয় না। এটা দেহগত জিনিস। আমরা কোথায় ছিলাম, কোথা হতে এলাম, কোথায় যাবো, আমাদের দেহের বৃত্তির মধ্যেই তা আছে।

আমাদের দেহের বৃত্তিগুলো আপনা থেকেই উদ্ভব হয়। সেই বৃত্তির নিবৃত্তির পথেই আমরা চলি। এই ইন্দ্রিয়গুলোই সেটা জানিয়ে দেয়, যদি সম্ভব মনে করে। তৃষ্ণা পেলেই জলপান করি। শুধু মুখের কথায় হয় না। **সৃষ্টির যে কোন বেগ আপনা থেকেই আসে। সেটা সেই ভাবেই স্ফূরণের ব্যবস্থা হয়। তবে কোথায় ছিলাম, কোথায় যাবো, তা যদি জানতে পারতাম, অনেক জিনিসের সমাধান হয়ে যেত। এক একটি জীব কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিল? কেন কাক হলো, কেন বিড়াল হলো; এই সবেরও সমাধান হতো। ইচ্ছামতন যে বলে যাবে, পাপের জন্য অথবা পুণ্যের জন্য কাক বা বিড়াল হলো, তা চলবে না।** সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। জানার মত জিনিস যখন আছে, জানতে যখন পারা যায়, তবে কেন এমন হলো? কেন জানা যায় না? সৃষ্টির মধ্যে জানানোর প্রয়োজন যেটা হয়নি, সেটার পিছনে যাওয়ার মানে কি? সেটা খুঁজে দেখার কি প্রয়োজন নেই? চেষ্টা করলে জানা যায়। সেই চেষ্টা কিভাবে করণীয় আমাদের পক্ষে? কি ছিলাম, সেটা জানার আকাঙ্খা সকলের থাকে. সহজে জানা যখন যাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে সেটা জানার প্রয়োজন নেই। তবে কেন আমরা সেটা জানতে যাব?

আমাদের সকলেরই জানা আছে, মৃত্যু হবে। এটাই হ'লো বড় জানা। বন্ধু বান্ধব সব আছে, আত্মীয়তা, ভালবাসার সম্পর্ক আছে। কিন্তু জানছি, থাকবো না। যমালয়ে কাঁটা দিয়ে, ভাই-এর ফোঁটা দিচ্ছে, আশীর্বাদ করছে, ধান-দুর্বা দিচ্ছে, সবই করছে। কিন্তু করলে কি হবে? এখানে থাকবো না, এটা নিশ্চিত। তবে কেন আসা? এখানে আসার কি প্রয়োজন? জন্মের থেকে শেষ পর্যন্ত এই যে স্তর ভেদ করে করে যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের সাথে লড়াই করে যাচ্ছে,

তাতে দেখতে পাচ্ছি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করেই চলেছে। এই যে দেবদর্শন, দেবালয়ে গমন, তাও ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি। তাহলে জন্মের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি পাচ্ছ? দেহের বৃত্তির নিবৃত্তির সাথে সাথে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। তাহলে তৃপ্তিই যদি আমাদের কাজ হয়ে থাকে, তবে আমাদের সাধনার ইঙ্গিত হচ্ছে তৃপ্তি। খেয়ে তৃপ্তি, শুয়ে তৃপ্তি, বাড়ী করে তৃপ্তি, গাড়ী করে তৃপ্তি। তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নেই। প্রকৃতির ধারায় প্রকৃতির গ্রন্থে এই পাঠই সবাই পাঠ করে চলেছে। জীবনধারায় প্রয়োজনের সাথে মিলিয়ে এই তৃপ্তির সাধনায় সবাই এগিয়ে চলেছে। এই যে গাড়ী দেখ, ঘোড়া দেখ, সবেতেই তৃপ্তি।

স্রষ্টার সৃষ্টির ইঙ্গিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? পৃথিবীর গর্ভে, পৃথিবীর উপরে স্রষ্টা তাঁর নিজের তৃপ্তির দিক থেকে যতরকমভাবে সাজানোর দরকার, সব করেছেন। এই **চন্দ্র, সূর্য, গাছপালা, মহাশূন্যে অনন্ত গ্রহনক্ষত্ররাজি শুধু আমাদের তৃপ্তির জন্য নয়। স্রষ্টা তাঁর আপন তৃপ্তিতে আপনাআপনি এতসব সুন্দরভাবে সৃষ্টি করে চলেছেন। সেই তৃপ্তির বস্তু হতেই আমাদের সৃষ্টি।** তিনি সৃষ্টিতে যা কিছু করেছেন বা করে যাচ্ছেন, সবেতেই যেন এক পরমাশ্চর্যের সুর। ঘর সাজাতে গেলে, বাগান সাজাতে গেলে যেমন একজনের প্রয়োজন হয়, তেমনই এত সুন্দর করে সাজানো যে এই পৃথিবী, তার স্রষ্টা কে? ঐ যে চন্দ্র, সূর্য, কোটি কোটি নক্ষত্র নীল আকাশে সব জ্বলছে— কি অদ্ভুত! পাহাড়ে কে এত মাটির ঢেলা উঁচু করে রেখেছে? কে এত গাছপালা সৃষ্টি করে রেখেছে? আকাশে কত চন্দ্র, সূর্য; পৃথিবীতে এত ফুল, ফল এমনভাবে সাজানো— এক পরম তৃপ্তির ঢেউ যেন সর্বত্র বয়ে যাচ্ছে। সেই তৃপ্তি থেকেই এই জীবজগতের সৃষ্টি।

প্রকৃতির মাঝে আমরা যা কিছু দেখি, তারা কথা বলে না। আপন মনে শিলা বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ের গা থেকে ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। বৃক্ষরাজি, গাছপালা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে আকাশমুখী হয়ে। তারা কথা বলে না। কেটে ফেললেও উঃ আঃ করে না। মাটি কেটে ক্ষত বিক্ষত করছো। সে দুঃখ করছে না। কিন্তু আমরা তাদের স্তন পান করেই মানুষ। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছি। **কথা না বলার বিষয়বস্তু থেকে আমরা সৃষ্ট হয়েছি। যারা কথা বলে না; কোন কিছুতেই বাধা দেয় না, তাদের হতেই আমাদের সৃষ্টি। এই প্রতিবাদহীন বিষয়বস্তু থেকেই আমাদের সৃষ্টি।** ধান কেটে গরু দিয়ে মাড়াই

হচ্ছে। সেই খড়, বিচালি খাচ্ছে গাভী। ঘাস খাচ্ছে গাভী। আর কি সুন্দর দুগ্ধ দান করছে। ধান, চাল, ডাল, তেল— সব মাটি থেকে পাচ্ছি; অদ্ভুত। যেখানে যাই, যা কিছু খাই— মাটি খুঁড়ে সব বের করছে। যাদের খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, তারা নির্বাক কর্মী। আমরা জাতিধর্মানির্বিশেষে স্থল, জল, আকাশে সর্বত্র তাদের উপর দিয়ে যাওয়ার অধিকার নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছি। যেমনি পারছি, যা খুশী করে যাচ্ছি। তারা নীরবে সব সহ্য করে চলেছে। তারা কথা বলে না। তাদের হতে যখন আমাদের উদ্ভব হয়েছে; আমরা জীবন পেয়েছি, নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে মহান জীবন রয়েছে। তাদের মাঝে জীবনের সাড়া না থাকলে আমাদের জীবন থাকতো না। সুতরাং তারা কে? আমরা যাদের উপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছি, তারা কাকে নিয়ে থাকে? তারা কোথা থেকে এসেছে? কোন্ দেশে যায়? তারা কিসের উপর নির্ভর করে? তাদের স্তন পান করেই আমরা মানুষ। তারা কেন প্রতিবাদ করে না? এইটুকু তো বুঝতে পারছো, তারা পৃথিবীর বুকে একই জল, বাতাসের আশ্রয়ে বেঁচে আছে। বাতাস থেকে টেনে আনছে তারা জীবনদায়ী অক্সিজেন। তাদের থেকে আমরা সেটা গ্রহণ করছি। সেই জল কোথায়? আলো কোথায়? এক পরম তৃপ্তির মহাসাগরে, এক পরমতৃপ্তির ডালা হতে সব যেন বেরিয়ে আসছে। ধাতু যেমন ঢালাই করে, এই এক অদ্ভুত ঢালাই; এক অদ্ভুত ব্যাপার; এক অদ্ভুত রহস্য। এই অদ্ভুতের সঙ্গে যুক্ত জীবজগৎ।

যাদের ধরতে গেলে ধরা যায় না, তাদের হতেই আবার সব, এই জীবজগৎ। এ হতেই যোগের সৃষ্টি। এক অপূর্ব যোগাযোগের সূত্রে যুক্ত হয়ে রয়েছে সবাই। তাদের স্পর্শে তাদের থেকেই আমাদের সৃষ্টি। এই অদ্ভুত খেল চলেছে সৃষ্টির সর্বত্র। সুতরাং আমাদের কি করণীয়? **শুধু শাস্ত্র গ্রন্থ, প্রেমের গ্রন্থই গ্রন্থ নয়। প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করতে হবে প্রকৃতির তত্ত্বদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।** আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতির মাঝে অতি সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। মাটি, জল, আলো, বাতাস (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ) প্রকৃতির এই মহান্ কর্মীরা নীরবতার মাঝে আপন আপন কর্মের মাধ্যমে আমাদের যেন বলে চলেছে, ''আমরা তৃপ্তির সেবাই করছি। তোমাদের তৃপ্তি দানের উদ্দেশ্যেই আমাদের কর্ম। তোমরাও তারই সেবা কর। তোমরা তারই সেবাইত হও। এক পরম তৃপ্তির তৃপ্ত্যর্থে, পরম তৃপ্তির পথিক হিসাবে তোমরা

এগিয়ে চল। আকাশপানে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে বল, 'কান, তুই শোন। জিহ্বা, তুই স্বাদ নে। চোখ, তুই দেখে যা। যে মহান তৃপ্তির মাঝ দিয়ে আমাদের পথ— তার সুর, তার সাড়া, তার সান্নিধ্য নিয়ে দেখে যা। যে ভাবনার উপর জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই ভাবনা ভাবে এনে পথ চল।''

প্রকৃতির মাঝে আমরা এই শিক্ষাই পাচ্ছি। সুতরাং ভাবনা যখন আছে, মন যখন আছে, চিন্তা যখন আছে, তখন এই জগৎটা চিন্তার ডালায় ঢেলে, **মনকে এক পরম তৃপ্তির ঢালাইয়ে ভরপুর করে রাখতে হবে। মনটা কি? মন হচ্ছে আকাশ। আকাশই মন। মনের বিষয়বস্তুটা মহান চিন্তার বিষয়বস্তুতে নিয়োজিত। স্রষ্টা মনের মতন করে এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সব বিষয়বস্তু এই জগৎ-ভাবনার মাঝে মন হয়ে যাচ্ছে। জগতের যা কিছু রূপ মন হয়ে যাচ্ছে। বিষয়বস্তুতে মন আছে বলে বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না।** কারণ এই বিষয়বস্তু যদি মন না হতো, তাহলে এত পরিবর্ত্তন হয়ে যেত না। এটা চিরকাল একই আকার নিয়ে থাকতো। ঐ একটা রূপেই থাকতো। পৃথিবীর কোন বিষয়বস্তুকে খুঁজে পাবে না। মন ঘুরছে, সমস্ত বিষয়বস্তু কর্পূরের মতো উড়ে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। পৃথিবীর যে কোন বস্তু মিশে যায় আকাশে বাতাসে; সবটাই যেন মনের সাথে যুক্ত হয়ে মিশে যায়। সবই তখন আমি হয়ে যায়; আমিময় হয়ে যায়। সমস্ত জগৎ আমার আমিত্বের জগৎ হয়ে যায়। আমিত্বের মধ্যেই তখন সকল বিষয়বস্তুকে পাই। যেখানে যা কিছু দেখি, সেখানেই আমি আমাকে খুঁজে পাই। কারণ আমা হতে জগৎ আমিময় হয়ে গিয়ে সেই মন স্রষ্টার সেই শক্তি, সেই সত্তা, যা হতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিরাট সত্তার সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মনকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। মনটা যে আমিময় হয়ে যায়, সেই আমি কোথায়? আমি কি চোখ? আমি কি হাত? আমি কি পা? কোন্টা আমি? আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবটা নিয়েই আমি হয়ে যায়। রাম সহস্র টুকরো হয়ে সহস্র নামে অভিহিত হলো। রামের কান, রামের পা, রামের হাত, রামের চোখ ইত্যাদি। তবে 'রাম' কোথায়? আবার দেহের সবটা নিয়েই হয় রাম। এইভাবে সমস্ত জগৎকে একটি দেহরূপে চিন্তা করলে সমস্ত জগৎই আমি। আবার জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে পৃথক করলে 'আমি' কোথায়? এই পাহাড়, নদী, গাছপালা, জল— এখানে 'আমি'

খুঁজতে গেলে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আবার সমস্ত জগৎকে 'এক' করে নিলে সমস্ত জগৎটাই আমি। 'আমিময়' এই জগৎ। যখনই জগৎ 'আমি' হয়ে যাচ্ছে, 'আমার' কথা বললেই জগতের কথা বোঝাচ্ছে।

এখন যদি বল, 'আমি' যদি জগৎ হই, আমার কথায় তো বৃষ্টি হচ্ছে না। আমার কথায় তো জগতে শান্তি হচ্ছে না। আমার কথায় তো পাহাড় কাঁপছে না। হ্যাঁ, রাজার ছেলে রাজকুমার, প্রকারান্তরে বংশানুক্রমে সেই রাজা। সেই রাজা এখন দৌড়াদৌড়ি করছে। রাজ সিংহাসনে বসেনি বলে, সে কি রাজা নয়? হ্যাঁ, ঐ রাজা হবে। সে এখন ঘুরছে। পঞ্চম জর্জ কি করেছিল? জাহাজে কয়লা ঠেলছিলো। বড় ভাই মারা গেল। রাজবাড়ী থেকে চিঠি পেল। বড় ভাই মারা গেলে সে-ই এসে রাজ হ'ল। কাজেই সে যে সিংহ। যত দলেই মিশুক না কেন, তার সিংহত্ব তো নষ্ট হতে পারে না। তোমরা যে সেই বিরাট 'আমি'র বাচ্চা। 'আমি' হয়ে কি করছো? কে রাজা? কে প্রজা? খেয়াল নেই। শুধু হুঁচোট পাচোট খাচ্ছ। সেটা সকল অবস্থায় হতে পারে। তোমার আসন কোথায় তুমি জান না। তোমার ভিতরে যেসব ক্ষমতা আছে, এখন পর্যন্ত সেসব ক্ষমতা পরিপক্ক হয় নাই। গাছটা যখনই পুঁতেছ, জানবে এর মধ্যে ফুল আছে, ফলও আছে। ফুল যে ফুটবে, জল ঢালছো কই? আরে বেটা, সময় তো চাই। **তোমার মধ্যে বীজ রয়েছে। স্রষ্টার বিরাটত্বের বীজ রয়েছে অঙ্কুর অবস্থায়। ফুটবার অপেক্ষায় রয়েছে; ফুটবে। কিন্তু গাছ যদি ছাগলে খেয়ে যায়, তাহলে কি করে হবে?** কতগুলো গাছ আছে, বাড়ে না। আবার কলমের গাছ দু' এক বছরেই ফল দিতে শুরু করে। এইরকম একটা গাছ ২০ বছর ধরে আছে; লম্বা আর হচ্ছে না। তার পাশেই আর একটা গাছ, অনেক বড় হয়ে গেছে। তবে কোন বীজেরই সত্তা নষ্ট হয় না। হয়তো ফুটতে সময় লাগছে।

আমাদের সহজ পথ কি? এই আমার আমিত্বকে কিভাবে অতি সহজে তার বিরাট সত্তায় ফুটিয়ে তোলা যায়? কিভাবে তার ফল পাওয়া যায়? কাজেই মহানরা বলছেন, কলম করে দাও। কলমে যে গাছগুলো হয়, লেবুগাছ আমগাছ; দেখা গেল সামনের বছরেই লেবু হল।

বড় গাছ কলমের গাছকে বলছে, 'আরে, তুইও গাছ, আমিও গাছ'।

ডাল হলে কি হবে, কলমের মধ্যেও আমার আমিত্ব থেকে যাচ্ছে। সকল অবস্থায় প্রতিবস্তুতে বিরাটের সেই সুরের সত্তা বয়ে যাচ্ছে। আমরা সব সময় এখন সেই অবস্থায় রয়েছি। বিরাটের বিরাট ক্ষমতা আমাদের মাঝে জাপ্য হয়ে রয়েছে। **আমাদের মধ্যে যেটা রয়েছে, আমরা যদি তার চর্চা করি, নিয়মিত তার সাধনা করে তাকে বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করি, তবে সুফল ফলবেই। যেমন গাছে জল দেয়, তেমনই যদি সাধনার সাথে যুক্ত হয়ে সারটার দেই, তবে আমিত্বটা অদ্ভুতভাবে ফুটতে শুরু করবে। এই বিশ্বজগতের কোথায় কি হচ্ছে, সব তখন বুঝতে পারবে।** কত সমস্ত কথা আছে, সব জানতে পারবে। এইভাবে দর্শন হয়, অতি সহজে দেখা হয়। তোমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। সাধনার যে নিয়ম, তার মাধ্যমেই যেতে হবে। অযথা স্বর্গ নরক, পাপ-পূণ্যের কতগুলো কথা এনে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করার কোন প্রয়োজন নেই।

তার আগে যে বলছিলাম, মাটি, জল, আলো, বাতাস (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ) প্রকৃতির এই মহান্ কর্মীরা নির্বাক হয়ে, নীরব কর্মী হয়ে আমাদের সকলকে, এই জীবজগৎকে সেবা করে চলেছে। এই যে গাছপালা, বৃক্ষরাজি, এরা আমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছে? এরা নির্দেশ দিচ্ছে, ''আমরা যেমন নীরব কর্মী হয়ে অক্লান্তভাবে তোমাদের তৃপ্তিদান করছি, তোমরাও সেইভাবে অগ্রসর হবে। তোমরা পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছ। পৃথিবী যেমন তোমাদের সব অত্যাচার সহ্য করছে; আমরা যেমন নীরব হয়ে তোমাদের সব অত্যাচার সহ্য করছি, তোমরাও সেভাবে নীরব কর্মী হয়ে আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করো; আমাদের নীরব কথা, আমাদের প্রাণের কথা প্রকাশ কর। আমাদের খেয়ে (গ্রহণ করে) তোমরা বেঁচে আছো। আমাদের কথাগুলো, আমাদের প্রাণের সাড়া প্রত্যেকের মধ্যে জানিয়ে দাও। তারই সেবায় নিযুক্ত হও। পৃথিবীর সেবাইত হয়ে জাতির কল্যাণে, দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করো। আমাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অতি নীরব। শুধু এইটুকু প্রকাশ করছি। আমাদের শৌর্য বীর্য নিয়ে বিরাটের সাধনায়, মহাশূন্যের সাধনায় মগ্ন আছি, যার জন্য আমাদের বাহ্যিক সাড়া পাওয়া যায় না সবসময়। তোমাদের (জীবকুলের) ভিতরে যেন সেই সুর জেগে ওঠে। তোমাদের ভিতরে প্রকাশের ক্ষমতা যখন আছে, তোমরা তারই সেবা কর।

তোমরাও নীরব কর্মী হয়ে তারই (বিরাটের) ধ্যানে মগ্ন হও। তোমাদের প্রকাশের ভঙ্গিমাতে যেন কোন বিকৃতি না আসে।

সেই যে বিরাট পুরুষ, সেই যে বিরাট সত্তা, সে অজানার মধ্যে নেই। এই বিরাট স্রষ্টা, অতি সহজ জানার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। তোমরা সূর্যের আলো পাচ্ছ। সূর্যের ভিতরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা ফলের আশা করে গাছ পোঁত। ফলের আশা করে বীজ পোঁত। গাছ হতে ফল তো পাচ্ছ। গাছের গোড়া কাটার তো প্রয়োজন নেই। **তোমরা এই পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছ। আবার আকাশে অগণিত পৃথিবী মাথার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতি যেন বলছেন, তোমাদের এইরকম পৃথিবীর ডালায় রেখে দিয়েছি। তোমরা নিজেরা প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহ হয়ে রয়েছ। এই অনন্ত গ্রহের শক্তি তোমাদের মধ্যে রয়েছে।** এই ভূর্ভুবঃস্বঃ সমস্ত পৃথিবীর ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে রয়েছে। এই যে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, চন্দ্র-সূর্য, অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্র, সকলেই সেই বিরাটের সাধনায় মগ্ন। তোমরা তা হতে সৃষ্ট। কাজেই তোমরাও সেই সাধনায় মগ্ন থাকবে। সেইভাবেই তোমাদের ভিতরের সত্তা বিরাটের সাড়ায় জেগে উঠবে। এইভাবেই তোমরা এসেছ। অন্য কোন বিভ্রান্তিতে যাবে না। এই পাঠই জীবনভোর করেছ। আজও করছো। চক্ষু চায় তার ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি করতে। কান চায় তৃপ্তি করতে। আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই চায় নিজ নিজ আকাঙ্খার তৃপ্তি করতে। তোমরা সাময়িক তৃপ্তির জন্য তিলে তিলে মরণকে বরণ করছো। আমরা চিরতৃপ্তির সন্ধানে ডুবুরী হয়ে সেই মহামৃত্যুর মহাতৃপ্তির দিকে যাচ্ছি। এই **মৃত্যুই হচ্ছে চরমতৃপ্তির নিশানা। জীবকে আক্কেল দেওয়ার জন্য মৃত্যু নয়। মৃত্যু হচ্ছে দুঃখ শোকের পরিসমাপ্তি। মৃত্যুর পথ দিয়ে পরপারে পথিক হয়ে, যাত্রিক হয়ে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথায় সেই মহান তৃপ্তি রয়েছে, যা থেকে এত তৃপ্তির ডালা বের হচ্ছে।**

তিনি কে? তাঁকে তো খুঁজে পাই না। তিনি খোঁজের মাঝে থেকে নিখোঁজের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করছেন। এই পৃথিবী কোথায় ছিল? কোথায় এত মাটি পেল? কে এই মাটি এতে (পৃথিবীতে) দিল? একটু মাটি আনতে গেলে একটা লোকের দরকার হয়। আর এই পৃথিবীর মাটি কোথা থেকে এল? একটা মাটির ঢিপি করতে হাজার হাজার লোকের দরকার হয়। কারা

এই পৃথিবীতে মাটি দিল? বিভূতি আর কোথায়? বিভূতি পায়ের তলায় (পৃথিবীতে)। কে এত মাটি ফেললো? সেই কর্মী কোথায়? আমরা হিমালয় পর্বত দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি? আর এই বিরাট পৃথিবী কোথা থেকে এল? এটা আগে চিন্তা করো। তখন মনে হবে কি অদ্ভুত। যিনি এটা করেছেন সেই ব্যক্তি কোথায়? এটা আপনা থেকে তো আসতে পারে না। বাপের পর বাপ; তারপর ছেলে, এই যে ধারাবাহিক ধারা, আমাদের চিন্তাধারাও সেইভাবে চলবে; কল্পনায় চলবে না। তুমি যার উপর (পৃথিবীর) দাঁড়িয়ে আছ, সেটা মূলাধার। আর উপরে সহস্রার। আকাশই সহস্রার হয়ে মাথার উপরে রয়েছে। এই পৃথিবী কোথা থেকে এল? সুতরাং এই যে রহস্য, রহস্যের পর রহস্য; অতীতের মাঝ দিয়ে বর্ত্তমান। সেই রহস্যের চিন্তায় বিভোর হয়ে যাও। সেই গভীর চিন্তার বিষয়বস্তু রয়েছে তোমার সামনে। তাকে সীমানার মাঝে টেনে আন রক্তচোষার মতন। মহাকাশে ভেসে বেড়ায় মেঘ। এই পৃথিবীর জল টেনে নেয় কিভাবে? সূর্য টেনে নেয় তেজ। তেজ হচ্ছে বীর্য।

তোমার মধ্যে রয়েছে সেই তেজ, সেই বীর্য। কেন তুমি টেনে আনতে পারবে না? টেনে এনে তুমি সৃষ্টি কর চৈতন্যের সাগর। তারপর ঢেলে দাও সহস্রারে, সহস্র ধারাতে। তুমিই সেই চৈতন্য। তোমার মন আকাশময় হয়ে রয়েছে। মনের এই যে অবস্থা, সেটাই নির্বিকল্প অবস্থা। তুমিই মূলাধার থেকে সহস্রার। চিদানন্দ ব্রহ্মানন্দের সাথে মূলাধার থেকে সহস্রারে একই সুর সৃষ্টি করছো। মূলাধার থেকে সহস্রারে তোমারই বিকাশ, তোমারই পরিচয়। জগতের বিষয়বস্তু থেকে টেনে নাও মন দিয়ে বিরাটের সেই সুর ও সাড়া। অনাহতে, বিশুদ্ধে সমস্ত জলরাশি পঞ্চভূত হয়ে কণায় কণায় ভরে উঠবে। জগতের সব রূপ, সে যে তোমারই এক রূপ। তুমি যে সত্য, তুমিই যে সেই সুর। তুমিই যে সেই স্বরূপের স্বরূপ। তোমার মাঝে বিরাট হয়ে বেজে উঠবে বিরাটের সেই ধ্বনি, সেই সুর। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সূর্য যেমন অজস্র জল মূহুর্ত্তে শেষ করে, তুমিও তোমার জ্ঞনাগ্নিতে মূহুর্ত্তে সমস্ত অন্যায় শেষ করে দাও

২৮, শরৎ বোস রোড, কোলকাতা - ২০
১৮ই জনুয়ারী, ১৯৬৭

আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্যই স্রষ্টা প্রকৃতির নিয়মে জলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষতার ভিতর দিয়ে আপন ক্ষমতার কিছুটা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। এই যে জল সে তো আবহমান কাল হতেই তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে স্বেচ্ছাধীনে মহাকাশের সর্বত্র বিচরণ করছে। এই যে বাতাসে জল মিশে আছে, বাতাস আকাশে মিশে আছে— এই যে ফাঁকা আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি ও মেঘের গর্জন হচ্ছে, বর্ষণ হচ্ছে, এই যে সূর্যের উত্তাপ এত দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এমনি করে সমস্ত জগৎটা এক গতিতেই চলছে। সমস্ত আকাশটাই তো জলে ভরা। আকাশে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু আছে, যেগুলো জলকানায় ভরা। ওরাই পৃথিবীর সব জল বহন করছে। যতদূর পর্যন্ত পৃথিবীর আকর্ষণ, আকাশে ততদূর পর্যন্তই জল।

এই যে জল সে একবার লোক চক্ষুর অন্তরালে বাষ্প হয়ে মহাকাশে মিশে যাচ্ছে ধূম্রাকারে মেঘের আকারে; আবার নেমে আসছে বারিধারার ধারাতে। একই জল একবার পৃথিবীর বুকে প্রবাহিত হচ্ছে, আবার মহাকাশে বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে সেই জলই আবার বৃষ্টি ও শিলার আকারে নেমে আসছে পৃথিবীতে। বিরাট ক্ষমতা এই জলের। তাই কখনও মেঘ হয়ে মহাশূন্যে গর্জন করছে, কখনও বা বিদ্যুতের আকারে ফাঁকা আকাশে চমক দিচ্ছে। শূন্যপথে Vanish হয়ে মহাকাশে গিয়ে আবার দেহধারণ করছে। মেঘগর্জনেই রয়েছে মহা নিনাদের ধ্বনি। মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি মেঘের হুঙ্কার, মেঘের ওঙ্কার, নিনাদ ধ্বনির সাথে শব্দব্রহ্ম। বিদ্যুতের এমন তেজ, এমন ঝলকানি যে মুহূর্ত্তে সবকিছু ভস্ম করে দিতে পারে। এমন অসীম ক্ষমতা

যে জলের, সেটা কিন্তু প্রকাশ পায়, যখন এখান থেকে চলে যায় মহাকাশে, মহাশূন্যে।

জলের সত্তা দিয়েই তৈরী এই জীবজগৎ। মেঘের আকার জলেরই আর এক রূপ। এই জগতে মেঘ পৃথিবীর স্পর্শে থেকেও অনেক আলাদা হয়ে রয়েছে। তার থেকে যে বারিবর্ষণ হয়; সাগর উৎপন্ন হয়; সেই মেঘখণ্ড আজও আকাশে এদিক ওদিক বিচরণ করে যাচ্ছে। কখনও জল থাকে, কখনও জল থাকে না। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও সে আকাশের বুকে আলাদা হয়ে আপন সুরে রয়েছে। এই যে এত রূপ, পৃথিবীতে যত রূপ আছে, মেঘেরই মত রূপ। যে রূপ ক্ষুদ্র হতে বড় হয়, যে রূপ আকাশে বাতাসে মিশে যায়, যে রূপ রূপান্তরিত হয়, যে রূপের পরিবর্ত্তন হয় মেঘেরই মতন; সে তো মেঘেরই আকারে, মেঘেরই ব্যাপকতায় ফাঁকার মাঝে আঁকা। কিন্তু তবুও একটু ব্যবধান আছে। আমরা ভূগর্ভের সঙ্গে যুক্ত আছি। স্পর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবসময় আছি। কিন্তু মেঘ ভূগর্ভের সঙ্গে যুক্ত হয়েও অনেক ব্যবধানে আছে।

আমাদের বুদ্ধিগুলি আমরা নিজেরাই খাটিয়ে চলি। আমাদের কুবৃত্তি যে আছে, মন যে খারাপ দিকে যায়, কেন যায়? কেন ভগবান বারণ করেন না? মন যে এদিক ওদিক যায়, যাওয়ার কারণ কি? সৃষ্টির রহস্য ভালভাবে জানা দরকার। **সন্তান যদি অন্তর থেকে পিতাকে সেবা না করে, আর একজন যদি শিখিয়ে দেয় পিতাকে সেবা করতে, তাহলে পিতা সেটা জানতে পারলে মনে বড় ব্যথা পাবেন এই ভেবে যে, সন্তান তাকে মন থেকে সেবা করছে না। তিনি জোর করে ভালবাসা নিচ্ছেন। প্রাণের হতে, মনের হতে যদি ভালাবাস না পাওয়া যায়, তবে সেটা কারও ভাল লাগে না।**

স্বাধীন চিন্তার উপর প্রতিটি জীব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মন এদিক ওদিক যে যাচ্ছে, কেন এদিক ওদিক যায়? তার জন্য প্রকৃতি বলছে, তোমাদের মধ্যে সজাগ (বিবেক, চৈতন্য) দিয়ে দিলাম। এর আগেও অনেকদিন বলেছি, আমাদের প্রত্যেকটি কাজে সজাগ (বিবেক) সর্বদাই সজাগ (সচেতন) করে দিচ্ছে। তাই ভুলে বা অনিচ্ছায় কেহ কিছু করে না। যে যা কিছু করছে সজাগ

হয়েই করছে। স্রষ্টার ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নাই। জীবকুলের সুবিধার জন্য তিনি সবরকম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানুষ যে বলে, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলে মন এদিক ওদিক যায়, তা বলা যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য যদি মেনে নেওয়া যায়, মন যে সবসময় ভাল হবে, তার কোন কারণ নেই। মনটা ঢালু এদিকে সেদিকে যাবেই। জলের মতো হুস্ করে চলে যায়। পূর্বজন্ম বা কোন কিছুর উপর মনের গতি নির্ভর করে না। তাহলে অনুভূতি, সিদ্ধি, মুক্তি— কিছুই হতো না। **যেকোন মুহূর্তে দেবতার দর্শন হতে পারে। যে কোন মুহূর্ত্তে সিদ্ধি মুক্তি হতে পারে। যে কোন মুহূর্ত্তে অষ্টসিদ্ধি লাভ হতে পারে। তাই জন্মজন্মান্তরের কর্মফলের উপর মন যে এদিক ওদিক চলবে, তা হতে পারে না।** কর্মফলের 'ই' টা (প্রাপ্তিটা) রোগ, শোক, দুঃখ-দৈন্যের মাঝে জীবনযাত্রার গতিটা চালিয়ে নেবে। নানারকম প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মন নিজেকে চালিয়ে নেয়। এগুলি কিছু নয়। তবে যদি এইভাবে সাধনা কর, যে কোন মুহূর্ত্তে যেকোন অবস্থায় মনের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হতে পারে। সুন্দরের পথে, দর্শনের পথে, সিদ্ধির পথে যা হওয়া দরকার, তা মুহূর্ত্তে হতে পারে। খারাপ চিন্তাধারাগুলো যে আসে, তাতে কিছু আসে যায় না।

চৈতন্য আমাদের সবসময় চৈতন্য করিয়ে দিচ্ছে। চৈতন্য আমাদের সবসময় সজাগ করে দিচ্ছে কখন কোন্ ত্রুটির মাঝ দিয়ে যাচ্ছি। তবে কেউ যদি কোন ত্রুটির মধ্যে আনন্দ পায়, তবে মনে রাখতে হবে সেই আনন্দ ক্ষণিকের জন্য। **শিকার করে হোক বা অন্য যেকোন দুষ্কর্ম করে হোক, যদি চিরকাল আনন্দে থাকতে পারে, যদি মন না খারাপ হয়, ঘুমের আগের মুহূর্ত্তে যদি মনে দাগ না কাটে, তবে সেটা ত্রুটি নয়। কিন্তু এমনই রহস্য দাগ কাটবেই।** একটা না একটা মুহূর্ত্তে ব্যথার হাত হ'তে, ত্রুটির হাত হ'তে রেহাই পাচ্ছে না। মনে দাগ কেটে যাবে। এই যে কসাই গরু কাটছে, পাঁঠা কাটছে, মুরগীগুলো কাটছে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে; কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে যে আঘাতের মাঝে ব্যথার মাঝে রয়েছে, তা হতে রেহাই পাবে না। কাজেই সৃষ্টির দিক থেকে, ন্যায়ের দিক থেকে যদি ত্রুটি থাকে, তবে সে প্রকৃতির নানা অবস্থার মাঝে জড়িয়ে পড়ছে। আর যারা জপ করে, ধ্যান করে, যারা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে, তাদের কথা আলাদা। ন্যায় অন্যায়টা প্রত্যেকের বুদ্ধি বৃত্তির উপর ন্যস্ত রয়েছে। সমাধান ভিতর হতেই হচ্ছে। জিহ্বা জানে, কোন্টা রাখা উচিত,

কোন্টা রাখা উচিত নয়। জিহ্বা আগেই সচেতন। যেটা খাওয়া উচিত নয়, সে ফট করে ফেলে দেবে। ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও যদি চুল গুড় মিশিয়ে খাও; সবাই না করছে। বাবা না করা সত্ত্বেও কাজটা করলে, ত্রুটি রয়ে গেল। তোমার অসুখ করবে। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

সাধনার কথা হ'ল, তোমাদের জীবনে চলার পথে প্রতি মুহূর্ত্তে যদি সজাগের মাঝ দিয়ে চল, তবে কোন ত্রুটি হতে পারে না। যেকোন বস্তু সৃষ্টি হবে, তাতেই প্রাণ আছে। সূর্য হতে যা কিছু সৃষ্টি হবে, তাতেই প্রাণ আছে। সৃষ্টি হলে তৈরী যখনই হবে, তার মধ্যে প্রাণ রয়েছে, চৈতন্য রয়েছে। মেঘের সাথে সম্বন্ধ কেন? মেঘ কোন্ সাধনায় ব্যস্ত আছে? আমাদের থেকে অনেক দূরে থেকেও মেঘ পবনকে আশ্রয় করেছে। সে বাতাসে আত্মসর্ম্পণ করেছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারের যে সপ্তরঙ, তা সে উপভোগ করছে এবং নিজেকে বিকশিত করছে। দেখা যায়, তার ভিতরকার চক্রগুলো পরিস্ফুট। আমরা সূর্যকে দূরের থেকে দেখছি। উপভোগ করতে পারছি না। আমরা শুধু তাপটা গ্রহণ করছি। মুখে জল নিয়ে ফুৎ করে ফেললে রামধনুর রঙ হয়। ভিতরে যে রঙ, আমরা সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। মেঘ সফল অবস্থায় প্রকাশ করছে। আর অনন্তরূপে নিজেকে বিকশিত করছে।

মেঘের মধ্যে অনেক রূপ প্রকাশ পায়। কখনও হাতি, কখনও হরিণ, কখনও শিব। জীবলোকে যতরূপ আছে, মেঘ ততরূপ নিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমি তোমাদের রূপে আছি। কখনও আমি পাহাড় হই, কখনও পর্বতের রূপ ধারণ করি। তার মধ্যেই যেন সূর্য বিকশিত হচ্ছে। মেঘের মধ্যে সূর্য লুকায়। তার ভিতর দিয়ে চাঁদ ছুটছে। মেঘ হতে গর্জন হচ্ছে। গুরু গুরু ধ্বনি হচ্ছে। মেঘ কোন্ শিক্ষা দিচ্ছে? সিদ্ধিমুক্তির পথে সহযোগিতা করার জন্য কোন্ মানচিত্র রয়েছে? **সিদ্ধি, মুক্তির পথে কে উপদেশ দেবে? আমাদের প্রতি কোন্ উপদেশ নির্দেশ রয়েছে? আমরা তো শূন্যে রয়েছি। আমাদের পায়ের তলায় আকাশ, মাথার উপরে আকাশ। মেঘ নিজে সাধক হয়ে, সিদ্ধ হয়ে নিনাদের সুরে নিজের জন্মের সংখ্যা মিশ্রিত করে বিদ্যুতের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে প্রকৃতির গ্রন্থের সাথে এক গ্রন্থ হয়ে রয়েছে।** মেঘের শব্দে, মেঘের গর্জনে বাড়ীঘর ভেঙে যায়। কোন বোমে (bomb) এরকম শব্দ হয় না;

এরকম বিদ্যুৎ চমকায় না। মেঘের মধ্যে হীরার টুকরার মতো বিদ্যুৎ ঝিলমিল করছে। আবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে সে (মেঘ) নিদাঘের রাগে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর কোন নাম নেই। মুখ দেখা যায় না। তার কোন রূপ দেখা যায় না। আবার অগণিত রূপ আছে। এখানে যত রূপ আছে, মেঘ সেই রূপ নিচ্ছে। একবার রূপ নিচ্ছে, আবার মিশছে। কারণ জন্ম এবং মৃত্যুর খেলা। তোমরা জন্ম নিচ্ছ, আবার মৃত্যুতে আকাশে মিশছো। প্রতি মুহূর্ত্তে মেঘের ভিতর দিয়ে রূপ নিচ্ছে। এতে কি শিখছি? মেঘের ভিতরে এত জল আছে, দেখলে বুঝা যায় না। সব জল যদি একসাথে ধপাস্ করে পড়তো, একদিনে সব শেষ হয়ে যেতো। এত সাগর আকাশের বুকে রয়েছে। বৃষ্টিধারায় পড়ার আগে গর্জন করে। তারপর বিন্দু বিন্দু করে করে পড়ে। এতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এই বিন্দু বিন্দু রূপ নিয়েই সব সৃষ্টি। আর আমরা কি করছি? বুঝেও কিছুই বুঝছি না।

বারিধারা পড়ছে পাহাড়ে পর্বতে, সারা দেশে। সেই মেঘ কি করছে? মেঘ যখন সিদ্ধির পথে মুক্ত হয়ে বিচরণ করছে, সে এমনভাবে বারিবর্ষণ করতে থাকে, যেন সব সজীব হয়ে ওঠে। সজীবতার সঙ্গে যুক্ত না হলে সজীব করতে পারে না। গাছ হতে নতুন পাতা জন্মায়। পৃথিবীর মাটি, জীব, গাছপালা সবকিছুতেই প্রাণের বিকাশ করার ক্ষমতা এর আছে। একাধারে সূর্য, একাধারে বাতাস, একাধারে জল। একাধারে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। জীবের মধ্যে যে ধাতু; তারমধ্যেও সেরকম ধাতু। আমরাও মেঘের মতো লীন হবো। মেঘের সাথে মিশবো। আমাদের ঘাম হচ্ছে। কিছু বিন্দু করে পড়ছে। আমরাও মিশবো। তবে বাধা কোথায়?

তোমরাও মেঘের মতো ছোটাছুটি করতে পার। তোমরাও মেঘের মতো বিচরণ করতে পার। মানুষের বুদ্ধি তো সর্বদা কল্যাণ কামনায় নয়। একজনকে মারবার বা হিংসা করবার বুদ্ধি কেন গজাচ্ছে? ছিনিয়ে নেবার বুদ্ধি তো আকাশের নাই। আমাদের মাথার ভিতরে সেই বিষয়বস্তু খেলবে, যে জিনিস আমাদের সাধনার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের মাথার উপরে সূর্য রয়েছে। আমাদের মাথার মধ্যেও সূর্যের তেজ আছে। আমরা সূর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহবীণাযন্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারের সেই সপ্তরঙের সাথে যুক্ত থেকে মুক্তির পথে

যাচ্ছি। এই অবস্থা যদি আমরা নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি, মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে পারবো। এই যে সূর্য দাউ দাউ করে জ্বলছে, সেটা আমাদের মধ্যেও রয়েছে। সেই চিন্তায় যদি আমরা সবসময় থাকি, আমাদের মুক্তি অনিবার্য। আমরা মুক্ত হয়ে মুক্তির পথে যাচ্ছি, এই চিন্তায় রত থাকলে আমাদের মধ্যে জেগে উঠবে সেই সুর। আমাদের যখন শ্মশানে নেয়, শ্মশানের ধোঁয়া ধোঁয়ার মত রূপ নিয়ে মেঘের সাথে মিশে যায়। মেঘকে সে আলিঙ্গন করে। জীবকে আলিঙ্গন করার জন্য অপেক্ষা করছে মেঘ। **আত্মা বিদেহী। এই আত্মাগুলো যে আছে, আমরা দেখি না। আত্মা আমাদের মধ্যে থেকেও বিদেহীর ন্যায় বিরাজ করছে। মেঘের সঙ্গে আত্মার রূপের যেন অনেক সামঞ্জস্য আছে। তার চেয়েও সুক্ষ্ম। আত্মাকে দেখতে পারছো না; বুঝতে পারছো। তবুও তাকে রাখা যায় না। আজ ৫০/৬০ বছরের যে বয়স নিয়ে চলছো, আকাম কুকাম করছো। মৃত্যুর পরে এই অবস্থা বুঝতে পারবে এবং আফশোস করবে।**

তখন প্রকৃতির কাছে আবেদন করবে, 'হে ভগবান, আবার আমাকে জন্ম দাও।' কারণ সে বুঝতে পারছে, ৫০ হাজার বছর তাকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে হবে। এই ঘূর্ণীপাক হতে যেন রেহাই পায়, তারজন্য আবেদন করছে। এরকম কাজ করেছে এখানে, যার জন্য ৫০ হাজার বছর সে ঘুরছে। একটা সাড়া নিয়ে বিরাজ করছে। আত্মাগুলি চিৎকার করছে, 'এই পৃথিবীতে যখন ছিলাম এই ৫০/৬০ বছরের জীবনে কত সুন্দরভাবে সব কিছু সমাধান করতে পারতাম। মাত্র ৫০/৬০ বছর তো মেসে (হোষ্টেলে) সাময়িক থাকার মতো। একটু ভালভাবে থাকলে এখানে চিরস্থায়ী বা চির জীবনের মতো আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম।' এই আফশোস, হায় হুতাশ থাকছেই।

আমার পিসীমা অনেক বছর আগে মারা গেছে। আমাকে খুব স্নেহ করতো। মৃত্যুর পরে আমাকে এসে বলে, ''রক্ষা কর। নইলে আমাকে হাজার হাজার বছর ঘুরতে হবে।'' আমি জল ছিটিয়ে দিলাম। চলে গেল। সেটা কিরকম জান? জল যখন বাষ্প হয়ে উপরে যায়, দেখা যায় না, যখন বৃষ্টিধারা রূপে পড়ে, তখন দেখা যায়। সেইরকম আত্মাটা যখন চলে যায়, দেখা যায় না। আবার পরে বরফের ন্যায়, ধোঁয়ার ন্যায় হঠাৎ এসে উপস্থিত

হয়। আত্মা যে আছে, কিভাবে বুঝবে? তোমরা ভাবো, জল নষ্ট হচ্ছে; এক ফোঁটাও নষ্ট হয় না। এটাই নিয়ম। এই যে জল খাচ্ছ, ফেলে দিচ্ছ; একটি ফোঁটাও নষ্ট হচ্ছে না। শুধু পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কাজেই তুমি এলে গেলেও (মৃত্যু হলেও) নষ্ট হবে না। তুমি থাকবে। জল শুকিয়ে গেলে সূর্য আবার fresh করে, পরিবর্ত্তন করে ছাড়ছে। সেইরকম মৃত্যু হয়ে গেছে, দেহ থেকে মন, প্রাণ টেনে নিয়ে গেছে; নষ্ট হবে না, শুধু পরিবর্ত্তন হয়। জল যেমন যায়, তেমনই যাওয়া আসা।

এখানকার (এই পৃথিবীর) মাটি নষ্ট হয় না। ধূলা নষ্ট হয় না। জল নষ্ট হয় না। এই যে যাওয়া আসা; বরফের মতন। সেটা নির্ভর করছে, **পৃথিবীতে থাকাকালীন প্রকৃতির এই স্বচ্ছ নিয়মধারার কতটা তুমি নিয়েছ, কতটুকু পালন করেছ। তার উপরই নির্ভর করছে তোমার গতি। মারা গেলে আত্মা বরফের মত যাচ্ছে আর চিৎকার করছে, "আমি যদি একটু ভাল কাজ করে আসতাম। তাহলে এমন হোত না।"** এক একটা আত্মা ৫০/৬০ হাজার বছর ধরে ঘুরছে। ঘোরার আর বিরাম নাই। তখন চিৎকার করতে থাকে, কোনরকমে একটা দেহ নিয়ে জন্ম নিতে চায়।

যাদের চক্ষু (ত্রিনয়ন) খুলে গেছে; যারা এই পথে ধাতস্থ হয়ে গেছে, তারাই বুঝতে পারে। এইরকম আত্মা সহস্র সহস্র ঘুরছে ধুলোর ন্যায়; বিদেহী হয়ে ঘুরছে। আত্মাগুলো, "রক্ষা কর। রক্ষা কর," বলে চিৎকার করছে। দেহ ছাড়া রক্ষা পাবে না। তার হাত হ'তে রক্ষা পেতে হলে, রেহাই পেতে হলে এখানেই কাজ করে যেতে হবে। জপ, ধ্যান ধারণাই একমাত্র কাজ। ঐ যে বাগমারী গেছিলাম, ৫০ বছর ধরে বুড়ীটার আত্মা ঐ ঘরে আছে। বুড়ীটা চিৎকার করছে। আমি জল ছিটিয়ে দিলাম। চলে গেল।

জলপাইগুড়ি গেছিলাম। যার বাড়ীতে গেছি তাকে বলি, 'আপনার মায়ের সাথে আলাপ করেছি।'

— সে কি, মা তো মারা গেছে।

আমি বলি, ঘণ্টাখানেক ধরে তার সাথে কথা বললাম।

সে বলে, এই ঘরে কাউকে শুতে দেওয়া হয় না। শুধু আপনাকে

থাকতে দেওয়া হয়েছে। এখানে মা আসেন। ভয় দেখাবার জন্য নয়। মুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন করতে আসেন। এটা দেখার জিনিস নয়। কখনও কখনও নিকটতমের কাছে দেখা দেয়; চিৎকার করে।

জন্ম সার্থক কেন? জন্ম না হলে দেহধারণ করে কাজ না করলে আত্মার মুক্তি হয় না। দেহের ভিতরে আত্মা বিদেহী হয়ে বাস করছে। তাকে দেখা যায় না। **এই জন্মটা চলে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করো না। কারও কোন কথার উপর নির্ভর করো না। এই যে গাছ ছায়ার মধ্যে রেখে দিয়েছে। ফুলতো ফোটে না অন্ধকারে। এটা আলোয় রেখে দিতে হবে। আলোর সঙ্গে যুক্ত হলেই ফুল ফুটবে। প্রকৃতির এমনই জিনিস নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই গণ্ডোগোল। কাজেই আমাদের কাজ হ'ল, প্রকৃতির নিয়ম পালন করা। প্রকৃতির গতির সাথে গতি মিলিয়ে যারা স্বচ্ছভাবে জীবনযাপন করবে, তাদেরই হবে। আর তা না হলে পরে আফশোস করতে হবে।** আবার এক মুহূর্ত্তে ফুটে যেতে পারে। কাজেই কর্মফলের উপর এটা নির্ভর করে না। রাজপ্রাসাদেও থাকতে পারে। সাময়িক বিপদগামী হলেও মনকে কেহ আটকাতে পারে না। তাতে দেবতাও হাত দেবেন না। ভগবানও কিছু করেন না। গুরু কি করেন? তিনি বলেন, "তোমার মনকে স্বচ্ছ রাখ। তুমি মেঘেরই মতো সেই পথের পথিক হও। সবটার মধ্যে থেকেও তুমি আলোক হয়ে, তোমার সত্তার ভিতর দিয়ে কাজ করে যাও।" অদ্ভুত কাজ হয়ে যাবে।

আমার তখন ৭/৮ বছর বয়স। এক বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ঐ বাড়ীতে যত বাচ্চা হয়েছে, একটাও বাঁচে না। বাচ্চা হবার সাথে সাথে বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা নাক বের হয়। নাকটা ফ্যাঁচ করে। আর বাচ্চা মরে যায়। ঐ বাড়ীতে অনেকগুলি বউ, একান্নবর্ত্তী পরিবার। এখন আমের সময়। তাদের অনেক আমগাছ আছে। শুনে বলি, "চলো যাই। আম খাব। বাচ্চা কেন থাকে না, তাও দেখবো।" আমি গেছি, বাচ্চা হয়েছে। উত্তর ঘরের বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শব্দ শুনছি। নাকটা যখন বের হয়, বেড়া হতে কঞ্চিও সরতে থাকে। আমাকে ডাকছে, "আসেন, নাকটা বের হচ্ছে।" আমি যতক্ষণ বসে থাকলাম নাক আর বের হয় না। তাদের বংশে বাচ্চা নেই। আমাকে রাত্রি ১২টা, ১টা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে দিয়েছে। আমি আর কি করি। ওদের বলি, একটু সুতো টুতো দাও তো বাঁধ দেই। লক্ষ্মণ তো সীতাকে বাঁধ দিয়ে

গেছিলো। আমিও এই রাম লক্ষ্মণ ধনুর্গুন এই বলে ও আরও কিছু বলে এসেছি। তখন আসে নাই। কিছুক্ষণ পরে আবার ধ্বনি হু হু করছে। ওরা ভয়ে তটস্থ হয়ে আমার কাছে দৌড়ে এসেছে। এইবার আমি একমুঠো বালি দিয়ে বলি, 'নাকটা এলেই এই বালি ছিটিয়ে দেবে।' নাকটা আবার এসেছে। নাক একবার লাল হয়, একবার নীল হয়, সাংঘাতিক ব্যাপার। যেই এসেছে, ঐ বালির মুষ্টি (মুঠো) ছুঁড়ে দিয়েছে। ফচ্ ফচ্ করতে করতে চলে গেছে। আর আসেনি। আবার ভোর চারটার সময় আমি বলি, 'দেখ, এক কাজ কর। আমি সমস্ত বাড়ীটাকে বের দেই। রাম লক্ষ্মণ ধনুর্গুণ করেও আরও কিছু বলে সমস্ত বাড়ীটাকে বের দিয়ে থুয়ে এসেছি। তারপর ঐ বাড়ির বুড়িটাকে ধরেছে, ''এই বুড়ি, তুই যাঁকে ধরে এনেছিস্, তাঁর থেকে এক ঘটি জল এনে আমার মাথায় ঢেলে দে। নতুবা তোদের বংশের কাউকে রাখবো না।'' আমি তারপর তাকে জল দেই। আগে যত ফকির টকির এনেছে, ওর কিছুই হয় নি। কতগুলি বাচ্চা তো চলে গেল।

সাগর যে দেখে নাই, গঙ্গার এই রূপ দেখে সাগর চিন্তা করবে কি করে? গঙ্গার এপারে ফ্যাক্টরী, ওপারে ফ্যাক্টরী। সাগর চিন্তা করা যায় না। **কি যন্ত্রণা মুখে বলা যায় না। আত্মাগুলি 'আমায় বাঁচান', 'আমায় বাঁচান', বলে চিৎকার করছে। সাধনমার্গে একটু যারা উঠেছে, তারাই বুঝতে পারবে। এমন অসম্ভব ব্যথা, এমন অসম্ভব আর্তনাদ সহ্য করা যায় না। মহাপ্রভু সব বুঝে দুই হাত তুলে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' বলে ছুট দিলেন। সমস্ত সাধুসন্ন্যাসী সাধনমার্গে উঠে এসে একে একটা পথ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সবসময় ঐ একই চিন্তা করবে।** তা ছাড়া আর যাই করবে, দাঁদের চুলকানি— শুধু ভুল বুঝাবুঝি হয়ে একটা অসোয়াস্তির ভাব সৃষ্টি করবে। মন রক্ষা করে চলার ন্যায় দুঃখ আর কিছুতে নেই। ছেলের মন রক্ষা করা, বৌয়ের মন রক্ষা করা, শেষে ঝি-এর মন রক্ষা করেও চলতে হবে। এত রক্ষা করে করে চললে, শেষে একটা রক্ষা না করলেই অশান্তি শুরু হয়ে গেল। ছেলে মাকে বকলো এমনি এমনি। মা বললো, 'বিয়ে করেছিস্। এখন তো বকবিই।' দিল বউয়ের নামে বদনাম। অজস্র রকমের অশান্তি আছে সংসারে। এতরকম বাধা নিয়ে চলতে পারে?

সাধু সন্ন্যাসীরা নেংটি পরে কেন? জঙ্গলে চলে যায় কেন? অশান্তির

ভয়ে। তারা বলে, আর মন রক্ষা করে চলতে পারবো না, ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয় মন রক্ষা। অফিসে গেলে সাহেবের মন রক্ষা। একটা লোকের কাছে শান্তি নেই। আর বুকের মাঝে সবসময় ধুক ধুক করছে। কেন শান্তিতে এখানে থাকতে পারে না? সব ফাঁকা লাগে কেন? কারণ কিছুই এখানে থাকার জিনিস নয়। যা ধরবে, তাই ফাঁকা। তুমি কেবল একটা জিনিসকে ধর। ভগবানকে ধর। আর তার মন রক্ষা কর, তাতে আপত্তি নেই। একটা পিঁপড়া ভাবছে, মুড়ি নিয়ে দৌড় দিয়েছে, কেহ বুঝি দেখে নাই। তুমি তো ঠিক দেখেছো। স্রষ্টার কাছ থেকে কখনও এতটুকু আড়াল হতে পারে না। সাগরে একটা কচুরী পানাতে কি হবে? দেবতার রাজত্বে কোন ত্রুটি সে দেখতে চায় না।

প্রতিমুহূর্তে ত্রুটি হচ্ছে, বেঠিক হচ্ছে। আর সজাগ (বিবেক) বলছে, 'তুমি ঠিক হও।' চৈতন্য, বা সজাগ যখন রয়েছে, তখন প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে সজাগ হতে পারে। খুনী খুন করে এসেছে। দেবতা বলছে, 'ত্রুটি করে এসেছ। যাক্, আবার সজাগ হও।' সজাগ না হয়ে যদি সরে যাও, বিপথগামী হয়ে এ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা। **সূর্য যেমন অজস্র জল মুহূর্ত্তে শেষ করে; তুমিও তোমার জ্ঞানাগ্নিতে মুহূর্ত্তে সমস্ত অন্যায় শেষ করে দাও। ত্রুটি সমস্ত বৈদগ্ধে দগ্ধ করতে পারবে। ত্রুটি হচ্ছে আর শুদ্ধ হচ্ছে। ত্রুটি হউক, ত্রুটিকে শোধন করে হও শুদ্ধ। আয় ব্যয় সমান হতে হতে দেখবে, আয়টা শেষে বেশী হয়ে গেছে। দৈনন্দিন যে ত্রুটি, তা হতে রেহাই পাবার পথ কি? জপ, ধ্বনি, গর্জন।** মেঘ জানাচ্ছে জীবলোককে, আমি যখন বর্ষণ করি, তখন জপের গুরু গুরু ধ্বনি, আলোর মাঝে জীবলোকে পৌঁছে দিই। ধ্বনি আর আলো সমন্বয় সুরে বাঁধা। এই যে ঘুমায়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকে, ব্যথা নেই, বেদনা নেই, ১০/১২ ঘণ্টা নাক ডাকছে। জাগ্রত অবস্থায় তুমি এমনি কর এক ঘণ্টা, নাক হ'তে রক্ত বের হবে। কিন্তু দশটা থেকে ৭/৮ ঘণ্টা সমানে নাক ডেকে চলেছে কোন ব্যথা নেই। কাজেই ঐ শব্দের মিলতি বাস্তবের শব্দের সাথে নেই। মেঘের ডাকের সাথে ঐ শব্দের মিলতি আছে। এটার ছিদ্র আলাদা। এটা যেন যাত্রার অভিনয়। ঐ ডাক যদি জেগে হয়, ঘুমিয়ে যেটা আছে, বাস্তবে যদি ঐ শব্দকে আনতে পারা যায়, তখন কিস্তিমাৎ। দেবতার রাজত্বে যখন যা হয়, সবই জানিয়ে দেয়।

প্রতিদিনের ঘুম একটা সমাধি। ঘুমের মাঝে এই যে নাকের ডাক ৭/৮ ঘণ্টা, এই ডাকটাই যদি বাস্তবে ফুটে ওঠে, মেঘের ডাকের সাথে মিল্‌তির সুর দেবে প্রতি মুহূর্তে আমাদের চলার পথে। রাবণ বলেছিল, স্বর্গের সিঁড়ি বানাবে। এই সিঁড়িটা কি সিমেন্ট পাথরের? সেই জিনিস নিয়ে আমরা আছি। **প্রকৃতির রাজত্বে সমাধির মত জিনিস নেই। ঘুমন্ত সমাধির মাঝে প্রতিদিন যে শব্দ করি, তা যদি জাগ্রত অবস্থায় আনতে পারি, ঐ দুটোর সুর যদি একসুরে আনা যায়, তবে সূর্য দর্শনের সঙ্গে দেবদর্শন অনিবার্য।** মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার, এই যে ধাপে ধাপে দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্র, এটাই স্বর্গের সিঁড়ি। ঘুমন্ত অবস্থার সমাধি যদি বাস্তবে আনতে পারি, তা হলেই হয়। খুব কঠিন নয়। আমরা প্রতিদিনের ঘুমটা সহজ করে নিয়েছি। ট্রামে বাসে বসে বসে ঝিমানি আসে। একে অপরের গায়ে পড়ি। অতি সহজ বস্তুর মধ্যে অতি মূল্যবান জিনিস দৌড়াদৌড়ি করছে তো। কিন্তু আমরা সঠিক মূল্য দিতে পারি না।

তাই হে জীবজগৎ সমাধি তোমাদের বাঁধা। গুরু গম্ভীর সুরে, নিনাদের সুরে সেই জপ আছে। যেই হরিনাম রয়েছে, যে জপ রয়েছে, **মহাপ্রভু যে বলছেন, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে। তাঁকে তোমরা স্মরণ কর। তাঁকে তোমরা বরণ কর। এই যে হরি, তাঁর সাথে এক সুর হয়ে যাও। তোমরা সেই কীর্ত্তন কর। সেই সূর্য ওঠে প্রভাতে। জবা কুসুমের সঙ্গে এক রঙ হয়ে যাও। তোমরা সূর্যমুখী হয়ে যাও।** সেই মূলাধার থেকে সহস্রারের সপ্তরঙ, তারই বিষয়বস্তু। আর আছে মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। তোমাদের মধ্যে রয়েছে সব। হবে অনিবার্য। আপনি সেই সুর বাজিয়ে যাও। মন প্রাণ ঢেলে দাও। ফুটে উঠবে সেই সুর; জাগবে অনিবার্যভাবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪